# নিষ্কৃতি

## - - মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

আমাদের শিবপুর হাই স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা হোসাইনী সাহেবের নিত্যসঙ্গী ছিল একটি ছাতা। স্কুলে, হাটে, মাঠে যেখানেই তিনি যাবেন সেখানেই কাধে লম্বমান থাকবে এই ছাতা। একদণ্ড ছাতাটি কাছ ছাড়া করতে আমরা তাকে দেখিনি। বাশের ডাটওয়ালা ওই ছাতার হাতলটা ছিল একটা বড় আকারের হুকের মতো। এটা দিয়ে অনায়াসে তিনি ছাতাটি কাধে ঝুলিয়ে নিতে পারতেন।

পুরনো আর জীর্ণদশাগ্রস্ত ছাতাটি রাখতে রাখতে হুজুরের শাদা পাঞ্জাবির স্কন্ধভাগে কালশিটে দাগ পড়েছিল। স্কুলে বিশেষত শিক্ষক মহলে হুজুরের ছাতা বিষয়ক নানান মুখরোচক কাহিনী চালু ছিল। স্যারদের কেউ কেউ তাকে ছাতাপীর সম্বোধন করতেন। ছাত্রদের কল্যাণে এই উপাধি আশপাশের এলাকায়ও দ্রুত প্রচার লাভ করেছিল।

তবে আমাদের অর্থাৎ ছাত্রদের জন্য হুজুরের ছাতা মোটেও কোনো সুখকর বস্তু ছিল না। কেননা হুজুরের স্কন্ধ মোবারকে সওয়ার হয়ে এই ছাতা আমাদের ক্লাস রুম পর্যন্ত পৌছে যেতো এবং শাস্তিদানের মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হতো।

হুজুর ছিলেন সুপণ্ডিত ও আদর্শ শিক্ষক। তিনি চাইতেন তার সাবজেক্টে ছেলেরা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করুক। কিন্তু তার আশা কখনো পূরণ হতো না। আরবি ও ইসলামিয়াতে ছাত্ররা ছিল অতিশয় অমনোযোগী।

সে সময় ক্লাস সিক্স–সেভেনে *আল আদাবুল জাদিদ, আল আদাবুল আসরি* নামক আরবি সাহিত্য সিলেবাসভুক্ত ছিল। আরবির বঙ্গানুবাদসহ পড়তে হতো। অথচ কম শিক্ষার্থীই আরবি হরফ চিনতো। আরবির ক্লাসে হুজুরের চোখে ধুলো দেয়ার নানান কৌশল আমরা রফত করেছিলাম। যেমন মূল টেক্সট বইয়ের আড়ালে আরবি উচ্চারণ নোটবই রেখে পড়া। কিন্তু হুজুরকে ফাকি দিতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতাম। নেমে আসতো শাস্তি। চপেটাঘাত কিংবা বেত্রাঘাত নয়, ছত্রাঘাত। যে কোনো অপরাধের কমন সাজা ছিল ছত্রাঘাত মানে ছাতার ঘা।

এই ছাত্রঘাত আরোপের জন্য একটি অভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন হুজুর। কোনো অপরাধে কোনো ছাত্রের শাস্তি প্রাপ্তি হলে হুজুর তার ছাতার হুকাকৃতির হাতলটা সেই অপরাধীর গলায় আটকে দিয়ে মাথাটি কাছে টেনে এনে এক হাতে কান ধরেন। তারপর ছাতার বাটের চোখা মাথা দিয়ে অপরাধের মাত্রাভেদে তিন থেকে পাচটা পর্যন্ত গুতো মারেন পেটে। এই গুতোর সংখ্যা তিনি জোরে জোরে

গুণতেন এবং তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অন্য সবাইকে নামতা পড়ার মতো করে সমস্বরে উচ্চারণ করতে হতো এক–দুই–তিন।

একটা ব্যাপার, হুজুর মেয়েদেরকে কখনো এই সাজা দিতেন না। হয়তো বেগানা আওরতকে স্পর্শ করা নাজায়েজ বলে। পক্ষান্তরে কোনো ছাত্রকে যখন এই শাস্তি দেয়া হয় তখন ছাত্রীরা সে দৃশ্য মজা করে উপভোগ করে আর মুখ চেপে হাসে। তবে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ ছিল *বেয়াকুব, বেতমিজ* ইত্যকার বিশেষণগুলো।

আমরা তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। এসএসসি পরীক্ষা কাছে আসছে। পড়াশোনার চাপ বাড়ছে আর হুজুরের এই শাস্তিও যেন ঘন ঘন নাজিল হতে লাগলো। সাবালকত্বের চিহ্নগুলো যখন শরীরে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠছে, মনে যখন পৌরুষ আর ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত হতে শুরু করেছে বয়ঃসন্ধিক্ষণের সেই চরম মুহূর্তে এরূপ ছত্রাঘাত, বিশেষ করে মেয়েদের সম্মুখে অপদস্থ হওয়াটা ভীষণ অপমানজনক ও ক্লেশদায়ক বোধ হতে লাগলো। ক্লাসের সবাই উপায় খুজতে লাগলাম, কি করে ছাতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আনোয়ার হোসেন আনু ছিল ক্লাসে দুষ্টুমি ও দুরন্তপনায় সেরা। সে বললো, তোমরা এই দায়িত্ব আমাকে দিতে পারো।

সর্বসম্মতিতে দায়িত্ব দেয়া হলো।

একদিন ক্লাসে মেয়েরা নেই, হয়তো কোনো বান্ধবীর নিমন্ত্রণে গেছে। হুজুর পড়াচ্ছেন। প্রায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে হুজুরকে আনু জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা হুজুর, প আর ফ–এর মধ্যে পার্থক্য কি?

হুজুর নোয়াখালীর লোক। এ অঞ্চলের অন্য দশজনের মতো তারও উচ্চারণগত সমস্যা প্রকট। এ জন্য উচ্চারণ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কোনো কিছু জানতে চাওয়া হলে হুজুর সেটাকে উপহাস মনে করে রেগে উঠতেন। আনুর প্রশ্নে তিনি তেলে–বেগুনে জ্বলে উঠলেন। *বেয়াদ্দব ফোলা! মশকারা করস। আরে ফাগল ভাবছস? দারা তবে ফ আর ফ–এর মইদ্দে ফার্থক্য বুইজ্জা দিতাছি* বলেই ছাতার গোল মাথা আনুর গলায় সেটিয়ে দিয়ে দিলেন হ্যাচকা টান।

আচমকা টানে আনু ছাতাশুদ্ধ হুজরের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। শুধু মটমট ফ্যাস ফ্যাস জাতীয় কিছু শব্দ শোনা গেল। তারপর একেবারে নিশ্চুপ। এমনভাবে পড়ে যাওয়াতে হুজুরের রাগ কমার বদলে বরং বেড়ে গেল। তিনি আনুকে ছাতা ধরেই উঠাতে গেলেন টেনে। কিন্তু ছাতার অর্ধাংশ খসে এলো। অপর অধাংশ আটকে রইলো আনুর গলায়। ছাতার কাপড় ছিড়ে ছিন্নভিন্ন।

প্রিয় ছাতার অবস্থা দেখে হুজুরের রক্ত যেন মাতায় উঠে গেল। আনুর শার্টের কলার ধরে উঠানোর জন্য টানতে লাগলেন। আনু অজ্ঞান। শার্ট–গেঞ্জি রক্তে মাখামাখি। মেঝে সয়লাব। হুজুর ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়লেন। আতঙ্কিত স্বরে স্বগতোক্তি করতে লাগলেন *হায়! আমি একি করলাম? ইয়া মাবুদ...। ওরে, তোরা দাড়িয়ে দেখছস কি? ফানি* আন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পানি আনা হলো। হুজুর বিড়বিড় করে দোয়া–দরুদ পড়তে পড়তে নিজ হাতে আনুর মাথায় পানি দিচ্ছেন। আমরা লম্বাখাতা দুলিয়ে বাতাস করছি। কিছুতেই তার জ্ঞান ফিরে না। হুজুর ভড়কে গেলেন। এক সময় ডুকরে কেদেই উঠলেন, *ইয়া আল্লাহ! এরে বাচাই দাও। এবা ভুল আর কক্ষুণো না করবাম।*

কে একজন বলে উঠলো এভাবে রোগী ফেলে না রেখে ডাক্তার আনা উচিত। হুজুর প্রস্তাবটা লুফে নিলেন। *এতোক্ষণ মনে করি দিসনি ক্যান?* যা, দৌড়ে গিয়ে ডেকে আন। পরক্ষণেই বললেন, তোদের কথায় এই অবলায় ডাক্তার আসবে না। আমিই যাই। তোরা *ফানি দে* বলে নিজেই ছুটলেন। হুজুর ডাক্তার আনতে গেলে আনোয়ার সকলকে অবাক করে দিয়ে হাসতে হাসতে সোজা উঠে দাড়ালো।

কিরে, তুই অজ্ঞান হসনি? আমাদের বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

আরে বোকার দল। হলে কি ছাতাটা ভাঙতে পারতাম?

আর এতো রক্ত?

তোরা দেখছি কিছুই চিনিস না বলে আনু বগলের নিচ থেকে আবিরের গাঢ়দ্রবণ মাখা খালি পলিথিন ব্যাগটা সবাইকে দেখালো। তারপর ভাঙা ছাতাটা হাতে নিয়ে আরো কয়েক টুকরো করে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। হুজুরকে আনুর আরোগ্যের খবরটা পৌছানো হলে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

পরদিন আনুসহ কয়েকজন মিলে একটা নতুন ছাতা কিনে এনে হুজুরের বাসায় গেলাম। তিনি প্রথমে আপত্তি করলেও আমাদের অনুরোধে ছাতাটি নিলেন এবং খুশি হলেন। কাঠের ডাটওয়ালা এই নতুন ছাতার হাতলে ছিল খুব সুন্দর কাচের পিণ্ড লাগানো। ছাতাটি হুজুর অত্যন্ত পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু সেটি কোনোদিন ক্লাসে আনেননি। এরপর আর কাউকে ছাতাপেটা খেতে হয়নি।

*বগুড়া থেকে*

## দাম এক পেনি

- - মনোয়ারুল ইসলাম শামীম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন ব্যঙ্গাত্মক ছড়া কবিতা *জুতা আবিষ্কার।* কবিতাটি দিয়ে জুতা আবিষ্কারের মূল ঘটনা জানা না গেলেও এর একটা হাস্যকর ধারণা পাওয়া যায়। জুতার মতো ছাতাও মানুষের অনেকাংশে চলার সঙ্গী। তবে এর আবিষ্কার নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়েছে কি না জানা যায়নি।

জুতা ব্যবহারে যেমন ধনী-নির্ধন নেই তেমনি ছাতা-ই সম্ভবত সেই সৌভাগ্যবান ব্যবহার্য যা রাজা বাদশাদের মাথার ওপর থেকে শুরু করে গলির মোড়ের জুতা সারানো মুচির মাথায়ও শোভা পায়। কিন্তু ছাতার শুরুটা হলো কি ভাবে? সবচেয়ে পুরনো এবং বৃটেনের সর্ববৃহৎ ছাতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান *সল শ্যাভারিয়ান অ্যান্ড সনস* যারা চার পুরুষ ধরে ছাতার ব্যবসা করে আসছে তারাও হয়তো এর সঠিক উত্তর দিতে পারবে না।

তবে এ ব্যাপারে যা জানা যায় তা হলো, খৃষ্টপূর্ব ১২০০ শতকে ইজিপ্টের উচ্চশ্রেণীর রাজ কর্মকর্তারা দাসদের দিয়ে বহন করা এক প্রকার কাপড়ের আচ্ছাদনের নিচ দিয়ে হেটে যেতেন এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে দাসরা সেটাকে ধরে নিয়ে হেটে যেতো। এ থেকে ছাতা তৈরির ব্যাপারটা কারো মাথায় হয়তো আসতে পারে। কিন্তু চায়না দেশীয় ইতিহাসবিদদের মতে, প্রথম ছাতা আবিষ্কার হয় খৃষ্টপূর্ব ১০০০ সালে চায়না দেশেই। লুই প্যান নামক একজন কাঠমিস্ত্রির স্ত্রী ছাতা আবিষ্কার করে এবং এ ব্যাপারে সে গর্ব করে বলে বেড়াতো যে, সে চলমান ছাদ আবিষ্কার করেছে। এরপর চায়নার সম্রাট একটি ছাতা তৈরি করেছিলেন যা হলো চার তলা বিশিষ্ট এবং দেখতে ছিল অনেকটা *প্যাগোডার* মতো। তার দেখাদেখি থাই রাজা নিজের আভিজাত্য বাড়ানোর জন্য সাত ছাদ বা তলা বিশিষ্ট ছাতা তৈরি করেছিলেন।

রোদ বৃষ্টি থেকে মানুষকে রক্ষা ছাতা করলেও এটা নিয়ে বিভিন্ন দেশ ও জাতিতে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন বিশ্বাস। ভারতে ছাতাকে উর্বরতা, চাষাবাদ, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের দেবতার সঙ্গী হিসেবে দেখা হয়। হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে দেখা যায়, দেবতা বিষ্ণু নরক থেকে মর্ত্যলোকের মানুষের উপকারার্থে বৃষ্টি দানকারী একটি ছাতা নিয়ে এসেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থান বোধি-বৃক্ষ তলে আজো ফুল ও ছাতা দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হয়। ফ্রান্সের সম্রাট ত্রয়োদশ লুই এমন তিনটি ছাতা তৈরি করেছিলেন যা ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকাজ করা।

এই আমাদের বাংলাদেশের একটি জেলা ছাতার কারণে পরিচিতি লাভ করলেও সেখানকার অধিবাসীরা হয়তো এ ব্যাপারে নিজেদেরকে পরিচয় দিতে বিব্রতবোধ করে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন

একটা জায়গা আছে যেখানে ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। ইটালির একটি পার্বত্য গ্রাম জিগনিজ যাকে সবাই ছাতার গ্রাম নামেই চেনে। আর এখানকার অধিবাসীরাও এ কারণে গর্ববোধ করে। ইটালির এই গ্রামটির অধিবাসীরা মূলত ভ্রাম্যমাণ ছাতা প্রস্তুতকারক এবং ছাতা মেরামতকারক। ছাতা মেরামতের জন্য তারা প্রতি বছর বসন্তে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং শরৎকালে বাড়ি ফিরে আসে।

এই গ্রামটিতে রয়েছে ছাতা বিষয়ক জাদুঘর। প্রতি বছর শুধু এই জাদুঘরটি দেখতে অনেক পর্যটক গ্রামটিতে ভিড় করে। এবং আরো আকর্ষণীয় করতে গ্রামটিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে *রিজিয়ন অফ আমব্রেলা* হিসেবে। প্রতি বছর লিফলেট ও ব্রৌশার-এর মাধ্যমে গ্রামটির বর্ণনা তুলে ধরা হয়। জাদুঘরটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কিছুদিন আগে। জিগনিজবাসীরা একত্রিত হয়ে যাবার সংগ্রহে রাখা বিভিন্ন ধরনের ছাতার সমন্বয়ে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। বর্তমানে জাদুঘরটিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এবং পৃথিবীর বিখ্যাত সব মানুষের ব্যবহার করা ছাতাও রয়েছে। ১৯৩৮ সালে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন-এর কাছে তার ব্যবহৃত একটি ছাতা জাদুঘরে রাখার আগ্রহ প্রকাশ করে একটি পত্র দিয়েছিল। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উক্ত ছাতাটি মিউনিখ থেকে *শান্তির প্রতীক* হিসেবে কিনেছিলেন এবং সেখানকার শান্তি আলোচনার বক্তৃতায় তিনি পৃথিবীর মানুষকে প্রতিকী হিসেবে একই ছাতার নিচে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ছাতাটিকে চেয়ে জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সেই আবেদন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ১০ নাম্বার ডাউনিং স্ট্রিট থেকে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। জাদুঘরে সেই অস্বীকৃতি পত্রটি এখনো রাখা আছে।

জিগনিজে ১৯৬৯ সালে ছাতার জন্য আরেকটি নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হয়। কাকতালীয়ভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় বৃষ্টি নেমে পড়ে। ভিত্তি স্থাপনের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উদ্যোক্তারা বৃষ্টিতে সবাই এক সঙ্গে একই ছাতার নিচে দাড়িয়ে আছে এমন ছবিটি তুলে জাদুঘরে রাখা হয়েছে। ইংরেজি শব্দ Umbrella এসেছে ইটালিয়ান শব্দ Ombrello থেকে যার অপভ্রংশ Umbra-এর ল্যাটিন অর্থ Shade বা Shadow।

ইংল্যান্ডে ছাতা পরিচিতি করেন জোনাস হ্যানওয়ে। হ্যানওয়ে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত শিশু এবং পতিতা পুনর্বাসনে সারা জীবন কাজ করেছেন। লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে তার স্মৃতিসৌধ আছে। কিন্তু তার সেই মহৎ কর্মের চেয়ে ইংল্যান্ডের মানুষ হ্যানওয়ে-কে মনে রেখেছে ছাতার কারণে। ইংল্যান্ডে তখনো ছাতার ব্যবহার শুরু হয়নি। কিন্তু সেই সতেরো শতকে জোনাস হ্যানওয়ে যখন ছাতা নিয়ে বের হতেন তখন রাস্তাঘাটে লোকজন তাকে দেখে বিদ্রূপ করতো এবং অবাক হতো। বাচ্চা

ছেলেমেয়েরা তার দিকে ঢিল ছুড়ে মারতো। অনেকে অবশ্য তার মাথার ওপর কালো আচ্ছাদনটির দিকে তাকিয়ে ভয়ও পেতো। জোনাস হ্যানওয়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল সেই ছাতাটি।

এরপর ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডের জনগণ ছাতা ব্যবহার করতে শুরু করে। তারপর সতেরো শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে ঘোড়া টানা গাড়ি থেকে শুরু করে টেলিস্কোপ, স্টুডিও এবং মানুষের হাতে হাতে ছাতা শোভা পেতে লাগলো। এমনকি অনেক সেনা অফিসার যুদ্ধক্ষেত্রেও ছাতার ব্যবহার শুরু করেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে তৎকালীন ডিউক অফ ওয়েলিংটন সেনাবাহিনীতে ছাতার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অবশ্য তার তখনো তরবারি লুকিয়ে রাখা যায় এমন হাতল বিশিষ্ট কারুকার্য করা একটি ছাতা ছিল। ওয়াটারলু-র যুদ্ধ সম্পর্কে স্মৃতিকথায় একজন ফরাশি মার্শাল লিখেছিলেন, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহী প্রতিটি বৃটিশ সৈন্য ছাতা খুলে হাতে নিয়ে এগোতে লাগলো যা দেখার মতোই একটি দৃশ্য ছিল। বৃষ্টি থেমে গেলে হঠাৎ করেই তারা ছাতা গুটিয়ে ফেলে তরবারি বের আমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে।

সমগ্র পৃথিবীতে এক সময় বৃটেনেই ছাতার দাম সবচেয়ে কম ছিল। কারণ বৃটিশ শাসিত বিভিন্ন কলোনি দেশগুলো থেকে তারা ছাতা তৈরির বিভিন্ন উপকরণ করমুক্ত অথবা বিনামূল্যে পেতো। এতে ছাতা প্রস্তুত করতে তাদের খরচ খুব কম হতো। ফলে এদের ছাতার দামও ছিল খুব কম। সেই সময় বৃটেনে মাত্র এক পেনিতে একটি ছাতা পাওয়া যেতো।

বৃটিশদের পর পরই জার্মানরা ছাতা প্রস্তুত ও ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রথম দিকে জার্মানদের ছাতার আচ্ছাদন ছিল বেশ বড়। আবার তারা এমন এক ধরনের ছাতা বের করেছিল যা খোলার সময়ে বাশির সুর অথবা হুইসাল বাজতো।

বিভিন্ন দেশে ছাতার আচ্ছাদনে নানান রকমের কারুকাজ করা কাপড় ব্যবহার করার পাশাপাশি হাতল তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু, হাড় ও পাথর। ছাতার হাতলে রৌপ্যের ও স্বর্ণের কাজ করাও দেখা গেছে। এছাড়া হাতির দাত, অনেক হিংস্র জন্তুর মাথা ও হাড় যেমন শিল মাছ, খরগোশ, পেচা, সাপ, এমনকি শিশুর মাথার মতো ছাতার হাতল তৈরি হয়েছে।

ছাতার রড বা হাতল আবার বিভিন্ন কাজের জন্যও তৈরি করা হয়েছে। আগের দিনে রাজা বাদশাদের ছাতার হাতলে তরবারি বা ছুরি লুকিয়ে রাখা যেতো। এবং হাতলে ব্যাটারি ব্যবহার করে রাতে পথ চলার টর্চ লাইট ছাড়াও অনেকে সিগারেট, কয়েন, পাউডার পাফ রাখার স্থান হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

ছাতা নিয়ে অনেক কুসংস্কারও ছড়িয়ে আছে। যেমন অনেকে বলে থাকেন, কারো হাত থেকে ছাতা মাটিতে পড়ে গেলে সে যদি নিজের হাতেই সেটা তুলে ফেলে তাহলে সামনে তার কোনো অশুভ ব্যাপার ঘটতে পারে। যদি সম্পূর্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কেউ ছাতা খুলে বসে তাহলে সেই ব্যক্তি বৃষ্টিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বুঝতে হবে। অনেকে মনে করেন, কোনো বিছানায় ছাতা শায়িত অবস্থায় অথবা ঘরের ভেতর ছাতা খুলে রাখাও ঠিক নয়।

অবশ্য একটা বিষয়ে অনেকে একমত হতে পারেন যে, ছাতা একটি ক্ষুদ্র মেকানিকাল ইনস্ট্রুমান্ট হলেও এর নিজস্ব একটা মেজাজ–মর্জি আছে। কারণ যখন তার মালিক চলে যায় তখনো সে পেছনে পড়ে থাকার প্রবণতা দেখায়।

*উত্তর গোরান, ঢাকা থেকে*

## চমৎকার বৃষ্টি

––**শাহীকাঞ্চন আহমেদ**

আমাদের বাড়িটাকে ঠিক শহরে বলা যায় না, শহরতলি। শহরের পাশ দিয়ে যে নদীটা বয়ে চলে গেছে তার নাম লৌহজং। এই লৌহজংয়ের পশ্চিমে মাঠ পেরিয়ে বাশঝোপ আর বেতঝোপের বন পার হলেই আমাদের শহরতলিটার সীমানা পড়ে।

বাড়ি থেকেই আমাকে প্রতিদিন একটা মিনি সাইকেল চালিয়ে বিন্দুবাসিনী হাই স্কুল এবং বর্তমানে মাহমুদুল হাসান কলেজে পড়তে হচ্ছে।

এই শহরতলির বাড়িটা ঠিক আমাদের বাড়ি নয়, নানার বাড়ি। মামাদের বাড়ি বললাম না এ জন্য যে, মামারা সবাই ঢাকায় থাকেন। একমাত্র ছোটমামা আমাদের শহরটার প্রাণকেন্দ্রে আদালত পাড়ায় বাসা করে সেখানেই থাকেন।

ছোটমামার বাসায় আমাকে নানান ধরনের কাজেই যেতে হতো। নানি একটু পায়েস রান্না করলে ভার পড়তো আমার ওপর সেগুলো পৌছানোর। এ রকম আরো কতো কি। ছোটমামার বাসায় লিজা আন্টিরা ভাড়া থাকতেন। ছোটমামির ছোট বোন। তিনিও আমাকে খুব আদর করতেন।

ঘটনাটা ওনাকে দিয়েই।

বড়মামা দেশে আসতেই আমার নানার বাড়ির ভেতরে কেমন যেন একটা উৎসব উৎসব ভাব ফুটে উঠলো। ছোটমামাও সপরিবারে মামাতো ভাইবোনদের নিয়ে শহরতলির বিশাল বাড়িতে চলে এলেন।

সঙ্গে লিজা আন্টিও এলেন। লিজা আন্টির হাজব্যান্ড জরুরি কাজে ঢাকা গেছেন তারপরও ছোটমামিকে নিয়ে এলেন।

সারাদিন খাবার–দাবার এবং নানির ফরমায়েশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। সন্ধ্যায় এক ঝলক বৃষ্টি এলো।

এর মধ্যেই ছোটমামা আমাকে ডাকলেন। কাছে গিয়ে দাড়াতেই তিনি বললেন, লিজার হাজব্যান্ড ঢাকা থেকে এসে পড়তে পারে। তুই তাকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় রেখে আমার ড্রয়ার থেকে ওষুধের বাক্সটা নিয়ে আসবি।

আমি মৃদুভাবে বললাম, আপনারা যাবেন না?

তিনি অবাক হয়ে বললেন, দেখছিস না, অনেক দিন পর ভাইজান গ্রামে এসেছেন, এর মধ্যে যাই কি করে?

বললাম, মামা, বৃষ্টিটা একটু কম হোক।

তুই এমন গবেট হলি কবে থেকে? কখন বৃষ্টি থামবে তার ঠিক আছে? তখন অন্ধকার নেমে যাবে। বৃজের কাছে গেলেই রিকশা পাবি।

লিজা আন্টিকে বললাম, আসুন লিজা আন্টি।

লিজা আন্টি একবার ছোটমামা আর একবার ছোটমামির দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে শাড়ির আচলটা মাথায় দিলেন। মাথার আচলে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিটা মানবে না। তারপরেও দিলেন। তবে দেখতে সুন্দর লাগছে।

ছোটমামি আমাকে ডেকে বললেন, ছাতাটা সঙ্গে করে নিয়ে যা।

লিজা আন্টিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে লিজা আন্টি বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চলছেন। তার একপাশটা ভিজে যাচ্ছে তারপরও তিনি ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখছেন।

আড়চোখে লিজা আন্টির দিকে তাকালাম। রাজশাহী সিল্কের কুচি ভেদ করে তার পেটের শাদা চামড়ার খাজ বেরিয়ে আছে। লিজা আন্টি নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যবতী। তবে চোখে পড়ার মতো মোটা নন। মাঠ পেরিয়ে গেলেই শহর মুখের পাকা সড়ক। সেখানে গেলে রিকশা মিলতে পারে। পাকা সড়কে পড়তে বেশ দেরি। একটু জোরে বৃষ্টি এলো। বললাম, আন্টি, ভিজে যাচ্ছেন তো, ছাতার নিচে আসেন।

লিজা আন্টি অসহায় ভঙ্গিতে আমার আরো কাছে সরে এলেন। এখন তার শরীরের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝেই স্পর্শ লেগে যাচ্ছে। আর আমি ইচ্ছে করেই ছাতাটা আমার দিকে একটু বেশি সরিয়ে

নিচ্ছি। আমার দিকে লিজা আন্টি  আরো সরে আসছেন। আমার কাধের সঙ্গে তার শরীরের আরো ঘনিষ্ঠ হচ্ছে।

আন্টি বললেন, তুমি একা ফিরে আসতে পারবে?

 ঝটপট উত্তর দিলাম, কতো আসি।

হঠাৎ করে প্রবল জোরে বৃষ্টি নামতে শুরু করলো। সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। ছাতাটা উল্টে যেতে চাইছে।

আমরা দৌড়ে গিয়ে বাশবনের পেছনে গিয়ে দাড়ালাম। ঝড় শুরু হলো। হঠাৎ আমার হাত থেকে ছাতাটা উল্টে গিয়ে কোথায় যেন উড়ে গেল। লিজা আন্টি ভয়ে কেদে ফেললেন।

আমি তার হাত ধরলাম। ভেজা হাত। বললাম, ভয় পাবেন না।

দূরে কোথায় বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিজা আন্টি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তার মস্তবড় বুক দুটো আমার বুকের সঙ্গে লেপ্টে গেল। এখন আমি তার খুব কাছাকাছি। আমি একটা হাত তার মাংসল কোমরে রেখে আরো চেপে ধরলাম। অন্য হাত ভিজে যাওয়া চুলের ভাজে।

কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করলাম, আমার বুকের মাঝে লেপ্টে থাকা তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। আমার কাধে এসে পড়ছে তার গরম নিঃশ্বাস। সহসাই এক অদ্ভুত আবেশে দুহাতে তার মুখটা ধরে তার ভিজে যাওয়া ঠোট দুটো পুরে দিলাম আমার ঠোটের ভেতরে।  লিজা আন্টি চোখ বুজে ফেললেন।

একটু পরে লিজা আন্টি নরম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো।

সারা পথ দুজনে হাত ধরে হেটে বাসায় চলে এলাম।

ছোটমামার লুঙ্গি পরে একটু ধাতস্থ হয়ে মামার ড্রয়ার থেকে ওষুধের বাক্স নিয়ে পাশের ইউনিটে নক করলাম। লিজা আন্টি ভেজা শাড়ি পাল্টে ফেলেছেন।

বললাম, লিজা আন্টি, যাই। আপনি বাইরের গৃলে তালা দিয়ে রাখেন।

লিজা আন্টি এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভেতরে এসো, আজ রাতে যেতে পারবে না। বৃষ্টির মধ্যে তোমাকে বাইরে যেতে দেবো না।

তিনি ভেতরে চলে গেলেন। কি এক অদ্ভুত সম্মোহনে তার বেডরুমে চলে গেলাম।

তিনি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মাথায় চিরুনি দিয়ে বললেন, এতো দুষ্টু হয়েছো কেন?  আমি সম্পর্কে তোমার খালা। কাজটা ঠিক হয়েছে?

বললাম, কোন কাজটা?

লিজা আন্টি আমার নাক টিপে দিয়ে বললেন, কোন কাজ জানো না, না? কচি খোকা!

আমি এর অর্থ বুঝে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে হ্যাচকা টান মেরে বুকের মাঝে এনে চেপে ধরে বললাম, একশ পারসেন্ট ঠিক।

লিজা আন্টি বললেন, এক মিনিট!

তারপর তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বুক থেকে শাড়ির আচল ফেলে দিয়ে চোখ বুজে দাড়ালেন। আমি তাকে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে লাগলাম। আমার অবাধ্য হাত দুটো ব্লাউজের বোতাম আর ব্রা-র হুক পেরিয়ে স্তন দুটোতে চলে গেছে। তারপর...।

এক সময় নিজেকে আবিষ্কার করলাম তার নিরাবরণ বুকের ওপর। পেটিকোটবিহীন ফর্শা উরুতে মিশে আছে আমার লুঙ্গি। বাইরে তখনো ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টি।

লিজা আন্টি আমাকে উঠিয়ে দিয়ে শেষ একটা চুমু দিয়ে বললেন, বাড়ি যাও। সবাই তোমার কথা ভাবছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে প্রকৃতস্থ করে গৃলের কাছে চলে এলাম। ওষুধের বাক্স বগলে নিয়ে বের হবো এমন সময় লিজা আন্টি বললেন, দাড়াও।

ভেতরে থেকে একটা ছোট ছাতা বের করে দিয়ে বললেন, ভিজে যাবে, এটা নিয়ে যাও।

হাটতে হাটতে বৃজের কাছে চলে এসেছি। সামনেই বাশঝোপ, বেতঝোপ, তারপরই মাঠ। মাঠ পার হলেই নানার শহরতলির বিশাল বাড়ি। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে এখনো। চমৎকার বৃষ্টি। আচ্ছা, বৃষ্টি কখনো চমৎকার হয়? এই চমৎকার বৃষ্টিটার লোভেই হয়তো ছাতাটা ফেলে দিলাম বৃজের নিচে। ছাতা ডুবে যাচ্ছে। দ্রুত ভিজে যাচ্ছি। তারপরেও সব কিছু চমৎকার লাগছে।

*টাঙ্গাইল থেকে*

## ইচ্ছা পূরণ

**- - আসম মোফাজ্জেল হক**

তখন ক্লাস এইটে পড়ি। বাবা একদিন অফিস থেকে ফিরে আমার হাতে নতুন ছাতা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, সাবধানে রাখিস।

ছাতাটা ছিল আমার তুলনায় বেশ খানিকটা বড়। উদ্দেশ্য যেন অনেকদিন ব্যবহার করতে পারি। তখন থেকে ছাতাটা আমার সারাক্ষণের সঙ্গী হয়ে গেল। রোদ-বৃষ্টি সব সময় এটা আমার সঙ্গেই থাকতো।

আমাদের বাড়ি থেকে স্কুল বেশ খানিকটা দূরে। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেলাম। স্কুল থেকে বেশ কিছু দূর আসার পর দেখি, একটি মেয়ে স্কুল ড্রেস পরিহিত অবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই রওনা দিয়েছে। মেয়েটির কাছে যেতেই দেখি, সামান্য পরিচিত আমাদের পাশের পাড়াতেই থাকে। নাম সীমা। গার্লস স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। স্কুলে যাওয়া–আসার পথেই একটু দেখা, হয়তো একটু চোখাচোখি। কথা হয়নি কখনোই। তার পাশে গিয়ে ছাতাটা দিতে চাইলে প্রথমে না করলেও আমার পীড়াপীড়িতে নিল। একই ছাতার নিচে থাকা সম্ভব নয় বলে ভিজতে ভিজতেই বাড়ির পথে রওনা দিলাম।

বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে বাড়ির দরজায় নক করতেই মা দরজা খুলে আমার অবস্থা দেখে অবাক হলেন, এবং ছাতা কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই বললাম, হারিয়ে ফেলেছি। এরপর সোজা বাথরুমে। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই শুরু হলো হাচি, শরীরে গরম ভাব, অবশেষে রাতে এলো প্রচণ্ড জ্বর। বাড়ির সবাই যথারীতি বকাবকি শুরু করলো ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফেরার জন্য।

প্রচণ্ড জ্বরে যখন ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল ছাতাটা না দিলেই ভালো হতো। এমন নায়কসুলভ আচরণ না করলেও চলতো, কেন যে ছাতাটা দিতে গেলাম এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা বুঝতেই পারিনি।

পরের দিন বিকেলে বাড়ির সবাই ড্রয়িং রুমে বসে গল্প করছিলাম এমন সময় ছাতা হাতে দরজায় সীমা হাজির। তার হাতে আমার ছাতা দেখেই যে যার মতো করে বুঝে নিল আসলে গতকাল কি ঘটেছিল। এরপর থেকেই বাড়ির সবাই আমাকে ক্ষেপাতে লাগলো, এতো সকালেই ছাতা দেয়াদেয়ি, পরে না জানি আরো কতো কিছু দেখবো।

এই ঘটনার পর থেকেই সীমা আর আমি কাছাকাছি এলাম। একই ছাতার নিচে না চললেও পাশাপাশি চলতাম। এতেই ভালো লাগতো, কেমন যেন একটা অন্য রকম ভালোলাগা। কোনো খেলায় জিতলে যেমন আনন্দ হতো, ভালো লাগতো এ ভালোলাগা যেন তেমনই। কেমন যেন একটা ভালো লাগা সারা দেহমনে ছড়িয়ে থাকতো। এ অনুভূতি এর আগে কখনো হয়নি।

স্কুল শেষ করে কলেজে এলাম। আমাদের বন্ধুত্ব আরো ঘনিষ্ঠ হলো। আমরা একই ছাতার নিচে এলাম। কখনো হাতটা ধরতাম আবার কখনো চোখের গভীরে চোখ রাখতাম। পরস্পর পরস্পরকে আরো নিবিড়ভাবে আপন করে পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। আমাদের বাড়ির সবাই ধীরে ধীরে ঘটনা জেনে গেল। অনেক কাঠ খড় পোড়ানোর পর তারা মেনেও নিল। মেনে নেয়ার পর থেকে আমাদের সম্পর্ক আরো সহজ, স্বাভাবিক এবং নিবিড়তর হলো।

একই ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পেয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। ভর্তি হবার পর দুজনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশের সম্মুখীন হলাম। আরো স্বাধীন পরিবেশ পেয়ে দুজনে ছাতা মাথায় দিয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো খোলা আকাশে উড়ে বেড়াতাম। সারাক্ষণ আমার হাতে ছাতা থাকার জন্য বন্ধুরা আমাদের ছাতা জুটি খেতাব দিল। ইউনিভার্সিটিতে এই নামেই ব্যাপক পরিচিতি পেলাম।

আজ এখানে এ ঘটনা লিখতে বসে মনে হচ্ছে, এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? ছাতা কিভাবে একটা মানুষের সারাক্ষণের সঙ্গী হতে পারে। সেই স্কুল থেকে আজ পর্যন্ত হিসাব মেলাতে পারি না। ভালোবাসার শুরু হয়েছিল ছাতার মাধ্যমে। হয়তো সেই থেকেই ছাতার প্রতি আমার আলাদা একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এসম্পর্ক এখনো আছে, থাকবেও।

প্রথম যেদিন দুহাতে সীমার মাথাটা ধরে চোখে চোখ রেখে ঠোটে গভীর এক চুমু দিয়েছিলাম সেদিন আশপাশে কেউ ছিল না। ছিল শুধু ছাতাটা। লজ্জা পেয়েছিলাম ছাতা চাক্ষুষ সাক্ষী হয়ে রইলো বলে। মনে হয়েছিল সে যেন সব কিছুই দেখলো, হয়তো একটু মুচকি হাসিও দিয়েছিল।

ছাতার সেই উজ্জ্বলতা আজ আর নেই, যৌবন সে তো কবেই শেষ। তার এই মলিনতা, এই প্রৌঢ়ত্ব আজ আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। তার দিকে তাকালেই আমার অতীত, বর্তমান সব দেখতে পাই। আর তখনই কষ্টে বুক ভেঙে যেতে চাই।

আমাদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা তখন শেষ হয়েছে। মেয়ের বিয়ের জন্য সীমার বাসা থেকে চাপ আসা শুরু হয়েছে। আমি বিয়ের জন্য সম্মতি দিলাম। ভীষণ আনন্দ আর হাসিমুখ নিয়ে সীমা বাড়ি চলে গেল। স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে। দুজনায় ভীষণ খুশি। কোথায় গিয়ে বাজার করবো। কি কি কিনবো। ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের কাকে কাকে বলবো এসব আলাপ করতে করতে সীমাকে বিদায় দিয়ে কি এক শূন্যতা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আবার কয়েকদিন পরেই আমাদের ভালোবাসার সফল পরিণতি সে কথা ভাবতেই ভালো লাগছিল। ছাতাকে ধন্যবাদ দিতে মন চাইলো, দিলামও। আমাদের বিয়ের জন্য ছাতাও যেন ভীষণ খুশি।

সীমা চলে যাবার দুদিন পর বাড়ি থেকে ফোন এলো যেন রিসিভার রেখেই রওনা হই।

আমি যখন সীমাদের বাড়ির সামনে তখন সবাই তার কফিনটা নিয়ে কবরস্থানের দিকে রওনা দিয়েছে। রোড অ্যাকসিডেন্ট, তারপর নিস্তব্ধতা। এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তা কখনই ভাবিনি। তাই সমস্ত অনুভূতিই যেন ভোতা হয়ে যাচ্ছিল। কফিনের পাশাপাশি আমিও হেটে চলেছি তখনো আমার বাম হাতে ছাতা। মনে হচ্ছিল আমরা যেন সেই আগের মতোই পাশাপাশি হেটে চলেছি। অভিমান পর্ব। তাই কথা বন্ধ। চোখের জলে সেই পরিচিত পথ ঝাপসা হয়ে এলেও হেটে চলেছি। মনে পড়তে

লাগলো সেই প্রথম বৃষ্টির ভেতর ছাতা দিতে এগিয়ে যাওয়া, স্কুল থেকে ফেরার পথে বিভিন্ন খুনসুটির কথা, ছাতার ভেতর আসার জন্য পীড়াপীড়ি করা, আমাকে দেখে রিকশা থেকে নেমে পড়া। তেমনি করে আজ তো কি পালকি থেকে নেমে পড়তে পারো না! জানি পারো, অভিমান করেছো বলে আজ আর নামবে না।

বর্ষাকাল। তাকে কবরে নামানোর সময় হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু হলো। আমি ছাতা দিয়ে বৃষ্টির জল আটকালাম। কিন্তু চোখের জলে তাকে ভিজিয়ে দিলাম। সারা জীবন রোদ-বৃষ্টি কখনোই তোমাকে কষ্ট দিতে পারিনি। আজ নিজেই ভিজিয়ে দিলাম। ক্ষমা করো। ভীষণ শখ ছিল আমার চোখের জল দেখবে, কষ্ট পাবে। তাই তোমার সে শখ পূরণ করতে পারিনি। আজ এ বেলায় তুমি কষ্ট পাও সেটাও চাইনি। কিন্তু পারিনি। যদি চোখের জল ঠেকানোর জন্য কোনো ছাতা থাকতো তাহলে তোমার সে শখ আজো অপূর্ণই রয়ে যেতো।

প্রকৃতির নিয়মে সব কিছুই একদিন স্বাভাবিক হলো। শুধু তুমি নেই, আছে শুধু তোমার স্মৃতি মাখা ছাতাটা। আজ এতোদিন পর শুধুই একটি কথায় বার বার মনে পড়ছে। কতোবার বলেছিলে প্রিয় যায়যায়দিনে লেখা পাঠাতে। তোমার সে ইচ্ছা এভাবে পূরণ হবে তা কখনোই ভাবিনি।

*বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে*

## রাজনৈতিক ছত্রছায়া

**- - আকরাম হোসেন হিমু**

ছেলেটার নাম সুজন। আমার অকৃত্রিম এবং অদ্বিতীয় বন্ধু। ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। হয়তো বা এ কারণেই দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড মিল এবং বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। ছোটবেলা থেকেই সুজন রগচটা স্বভাবের ছিল। তাই অন্য সবাই তাকে এড়িয়ে চলতো এবং কিছুটা ভয়ও পেতো। আমাদের স্কুলে এমন কোনো ছেলে ছিল না যে সুজনের হাতে মার খায়নি। এ কারণে সব শিক্ষক শিক্ষিকাই সুজনের ভবিষ্যৎ বাণী করে বলতেন, এই ছেলে বড় হলে সন্ত্রাসী হবে।

সুজন এখন বড় হয়েছে এবং শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ বাণীও সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগের এক নেতার ছত্রছায়ায় সুজন পাতিমাস্তান থেকে মাস্তান হয়। এবং এরও কিছুদিন পর অন্য এক নেতার অনুপ্রেরণা এবং পলিটিকাল সুযোগ সুবিধা পেয়ে সুজন হয়ে গেছে পরিপূর্ণ সন্ত্রাসী।

প্রচণ্ড জেদি এবং একরোখার কারণে সবাই সুজনকে সমীহ করে চলে। তবে আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আগের মতোই আছে। তার সঙ্গে আমার দেখা হলেই আমায় বলে, তোকে কেউ কখনো কিছু বললে আমায় বলবি, ধরে এনে একেবারে হাত–পা ভেঙে দেবো।

তার কথা শুনে শুধু হাসি কিছুই বলি না। একদিন সুজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোকে যে কিছুদিন পর পর জেলে নেয় তারপর আবার ছাড়া পাস কিভাবে?

একগাল হেসে উত্তর দেয় সে, নেতা আছে না?

নেতা ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়। তাদের গাড়িতে করে একেবারে বাসায় নামিয়ে দিয়ে যায়। এ কথাটি বলেই হাসতে থাকে সুজন। আমি তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, তার হাসির অর্থ খোজার চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না।

দীর্ঘ দিন সুজনের কোনো খোজ না পেয়ে একদিন তার বাসায় যাই। বাসায় গিয়ে শুনলাম সে হাসপাতালে। এটা শুনেই হাসপাতালে যাই তাকে দেখতে।

আমাকে দেখেই সে হেসে বলে, খবর পেয়েছিস কার কাছ থেকে?

তোদের বাসায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে খবর পেয়েই এসেছি। তার দুই পায়ের ব্যান্ডেজ দেখে প্রশ্ন করলাম, তোর পায়ে কি হয়েছে?

আগের মতো হাস্যোজ্জ্বল মুখে উত্তর দেয় সুজন, আমাদের অ্যানটি পার্টির কয়েকটা ছেলে আমাকে একা পেয়ে ধরে ড্রিল মেশিন দিয়ে দুই পায়ের মধ্যে চারটি ছিদ্র করে দিয়েছে। তাই পায়ে ব্যান্ডজ। সেদিন আমার সঙ্গে যন্ত্র ছিল না। না হলে একটাকে না একটাকে ফেলে দিয়ে আসতাম।

সুজনের কথাটি শুনেই আমি আতকে উঠি। অথচ সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বললাম, তোর কষ্ট হচ্ছে না?

সুজন আবারও হাসতে হাসতে বললো, কিছুদিন আগে একটা উপন্যাস পড়েছিলাম *কষ্টের মাঝে বসবাস* আমি সেই উপন্যাসের নায়কের মতো হতে চাই। তাই আমার চারদিকের ঘিরে থাকা কষ্টগুলোকে হাসি দিয়ে ঢেকে রাখি।

সত্যিই কি হাসি দিয়ে কষ্টকে ঢেকে রাখা যায়?

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুজন বললো, তুই এখন যা হিমু। আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না। তিন দিন পর আমাকে রিলিজ করে দেবে। তুই বাসায় আসিস।

সুজন হাসপাতাল থেকে রিলিজ পাবার পর আবার তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে দেয়। এবং আগের চেয়েও গুরুতর রূপ ধারণ করে। এই পর্যন্ত তাদের বিপক্ষ দলের ১৩জনকে সে ধরে এনে কুকুরের ইনজেকশন দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তারা সবাই এখন পাগল। ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। মাঝে

মাঝে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন ধরে নিয়ে আসে সে। এরপর মেরে হাত–পা ভেঙে হাসপাতালের সামনে ফেলে দিয়ে যায়। মানুষজন কোনো প্রতিবাদই করে না, দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

সেদিন সন্ধ্যায় টাউন হলের মোড়ে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমাকে দেখেই একগাল হেসে প্রশ্ন করে সে, কেমন আছিস হিমু?

ভালো, তুই কেমন আছিস?

ভালো না।

কেন?

আগে যে নেতার দলের হয়ে কাজ করতাম সেই নেতা দল থেকে বের করে দিয়েছে। দলের কয়েকটা ছেলের সঙ্গে আমি মারামারি করেছি, তাই।

তার মানে তুই এখন আশ্রয়চ্যুত?

হাসতে হাসতে উত্তর দেয় সে, না, সুজনরা কখনো আশ্রয়চ্যুত হয় না। এক ছাতা মাথার উপর থেকে সরে গেলে অন্য ছাতা এসে ছায়া দেয়। আর এক ছাতার নিচে বেশিদিন থাকতে না পারাটাই হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

এ কথাটি বলেই একটি খালি রিকশায় উঠে চলে যায় সুজন।

*নোয়াখালী থেকে*

## অনীহা

**- - খোকন**

আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগের কথা। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়তাম। আমরা ছয় ভাই–বোন সবাই মোটামুটি ভালো ছাত্রছাত্রী ছিলাম। কিন্তু জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় আমার বড়আপা ছাড়া আর কেউ বৃত্তি না পাওয়ায় আমার বাবা–মা হতাশ হলেন। আমি আবার ছোট এবং অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত একটু ভালো ছাত্র হওয়ায় ক্লাস এইটে বৃত্তি পাওয়ার জন্য আমার উপর গুরুদায়িত্ব চাপলো। বাবা–মা এবং আমার বড় ভাইবোন সবাই আমাকে অতি উৎসাহ–উদ্দীপনা দিতে লাগলেন যে, তারা ফ্লপ মারলেও আমাকে সফল হতে হবে।

এখনকার মতো তখন আমাদের বাসায় বিদ্যুৎ ছিল না। একমাত্র বাবার আয়েই সংসার চলতো। তাই নিম্নমধ্যবিত্ত সংসার হওয়ায় অতি কষ্টে অর্থাৎ একটি মাত্র হারিকেন দিয়ে সবাইকে লেখাপড়ার কাজ চালাতে হতো। তখন দেখি কেউ ভালো কিছু করলে বাবা–মা, ভাই–বোন অথবা বন্ধুদের কাছ থেকে

উপহার পায়। কোনো কোনো বাবা-মা তার সন্তানের সফলতার জন্য কোনো কিছু দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সে সময় আমাদের সংসারে অসচ্ছলতার কারণে কোনো উপহার ছাড়াই শুধু মৌখিক ভালোবাসা এবং উৎসাহই ছিল মূল প্রেরণা।

যাই হোক। সবার উৎসাহে আমার লেখাপড়া পুরোদমে চলতে লাগলো। এরই মধ্যে বৃত্তি পরীক্ষার সময় এগিয়ে এলো। যথাসময়ে জেলা সদরে পরীক্ষা দিতে গেলাম। যদিও স্যারদের তত্ত্বাবধানে গিয়েছিলাম তবুও বাবা-মায়ের বেশি আশা থাকায় আমার সঙ্গে বাবাও গিয়েছিলেন। মোটামুটি সন্তোষজনক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

এখানকার মতো তখন এতো পত্রিকার প্রচলন ছিল না বলেই হঠাৎ করে তিন চার মাস পর রেজাল্ট বের হলো। রেজাল্টে সবার কাঙ্ক্ষিত প্রথম গ্রেডে বৃত্তি না পেলেও সবাইকে হতাশ না করে দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি পেলাম। বৃত্তি যে একদম মিস হয়নি এটা মনে করে বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই খুশি হলেন। তাই যথাসম্ভব মিষ্টি কিনে পাড়া প্রতিবেশীকে খাওয়ানো হলো। সুখবর আমাদের গ্রামের বাড়ির চাচা-চাচিসহ সবাইকে জানানো হলো। যে চাচাকে আমার আব্বা কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন সেই চাচা রেজাল্টের খবর শোনার পর আমাদের বাড়িতে এলেন। সঙ্গে আমার জন্য সুন্দর একটি ছাতা নিয়ে এলেন। তখনকার দিনে আমরা যাকে টিপ দেয়া ছাতা বলতাম।

বৃত্তি পাওয়ার পর কেউ কিছু না দেয়াই এই ছাতা পেয়ে আমি এতোই খুশি হলাম যে, মনে হলো যেন বিশ্ব জয় করেছি। কারণে অকারণে ছাতা নিয়ে বের হতাম। কোনো ভাই-বোনকে ধরতেও দিতাম না। শুধু বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকতাম। বৃষ্টি হলে কারণ ছাড়াই ছাতা নিয়ে বাইরে বের হতাম।

সবার কপালে সব সুখ হয়তো বেশি দিন স্থায়ী হয় না। আমার কপালেও নেমে এলো এমনি এক ঝড়। কিছুদিন পর আমার সেই চাচার সঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়ির জমি-জায়গা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হয়। তাই চাচার সঙ্গে আমাদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। এর কিছুদিন পর আমার সেই চাচা হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এলেন। যদিও তার সঙ্গে আমাদের কথা বন্ধ তবু আমরা তাকে যথেষ্ট সম্মান করলাম। সবচেয়ে বড় আঘাত পেলাম পরদিন চাচার যাবার সময়। আমি তখন আমার গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ছিলাম। চাচাও যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হঠাৎ করে তিনি আমার বাবা-মাকে বললেন যে, তিনি যে ছাতাটি আমাকে উপহার দিয়েছেন সেটা তিনি ফিরিয়ে নিতে চান। এই কথা শুনে বাড়ির সবার মনে হলো আকাশ থেকে পড়লো। কেউ উপহার দিয়ে ফিরিয়ে নেয় এটা কারো জানা আছে কি না সন্দেহ তা সে উপহার যতো কম দামের হোক না কেন?

উপহার উপহারই। কখনো টাকা দিয়ে উপহারকে মূল্যায়ন করা যায় না। ছাতাটি বের করে দিতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। সে দৃশ্য যে কি বেদনাদায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। বাড়ির সবার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি বের হলো। মনে হলো বাড়িতে কেউ যেন মারা গেছে। আপন চাচা যাকে আমার বাবা মানুষ করেছেন সেই কি না একটা উপহার দিয়ে ফিরিয়ে নিলেন। আমার গৃহশিক্ষক আমাকে শুধু একটা সান্ত্বনাই দিলেন। বাবা, তুমি বড় হও, মানুষ হও।, দেখবে প্রতিদিন একটি করে ছাতা কেনার যোগ্যতা তোমার হয়েছে। আমার সেই শিক্ষকের কথাই বেশি মনে পড়ে। এখন আমার ছাতা কেনার যোগ্যতা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে ছাতা ব্যবহার করার প্রতি কেমন জানি অনীহা। আমার সেই চাচাকে দেখলে এখনো সেদিনকার বেদনার কথা আরো বেড়ে যায় যে বেদনা কোনোদিন ভুলবো না। সত্যিই কষ্টদায়ক।

*নাটোর থেকে*

## চাকরি

**-- -- এএম রাজীব উদ্দিন**

ছাতা ধরে চাকরি? মামা-চাচা ধরাধরি হলে না হয় একটা কথা ছিল। তাই বলে একেবারে ছাতা ধরে চাকরি! এও বিশ্বাস করতে হবে? ছাতা ঘুস দিয়ে চাকরির ব্যবস্থা হলে না হয় বিশ্বাস করার একটা উপায় থাকতো। তাই বলে ছাতা ধরাধরি! জি জনাব, ছাতা ধরে আমার চাকরি হয়েছিল। জানি, আপনারা বেশ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। তাহলে খুলেই বলি।

২০০০ সালের আগস্ট মাসের কথা। মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ। অখণ্ড অবসর। কিছুই করার নেই। হন্যে হয়ে চাকরি খুজছি। একটার পর একটা অ্যাপ্লিকেশন ছেড়েই যাচ্ছি। কিন্তু চাকরি নামের সোনার হরিণের দেখা কোনোভাবেই পাচ্ছিলাম না। চাকরিই বা হবে কোথা থেকে। ইন্টারভিউ কার্ডই তো আসছে না। ইন্টারভিউ দিলেই তো চাকরি পাওয়ার ব্যাপার আসে। কথায় বলে *নেই কাজ তো খই ভাজ।* বেকার আর আড্ডা নাকি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। সারা দিন টো টো করি। এবং বিকেলে নিয়মিতভাবে সেন্ট্রাল প্লাজায় আড্ডা দিই। মেয়েদের প্রিয় মার্কেট হিসেবে এটার আবার বিশেষ সুনাম আছে। এটা হলো আমার কমন রুটিন।

সেদিনও আড্ডা সেরে বাসায় ফিরছিলাম। জিইসি মোড়ে প্রচণ্ড জ্যাম এবং এর সঙ্গে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। বায়োডাটা, সার্টিফিকেটের কপি এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবি ছাড়া যে জিনিসটা আমার ব্যাগে সব সময় থাকে সেটি হলো আমার অতি প্রিয় ডাভ (Dove) ছাতা। যখন বৃষ্টি নামে তখন আমি রাজা। শুধু আমার মাথার ওপর ছাতা থাকে। আর সবাই আমার প্রজা।

সেদিনও  আপন মনে ফুটপাথ দিয়ে হাটছিলাম। হঠাৎ চোখ আটকে গেল সুদৃশ্য একটা পাজেরো জিপে। তখনো তুমুল বৃষ্টি। গাড়ি থেকে নামছেন একজন অসাধারণ সুন্দরী বিদেশিনী। দেখতে অনেকটা আমার সাবেক প্রেমিকা প্রিন্সেস ডায়ানা-র মতো। আগ-পিছে না ভেবে তার মাথার ওপর ছাতা ধরলাম। অনুমতির ধার ধারলাম না। অনুমতির দরকার কি? ডায়ানা-কে শেল্টার দেয়া যে তখন আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি।

একই ছাতার নিচে আমরা দুজন হাটছি। টুকটাক কথাবার্তা হচ্ছে। জানলাম তিনি ইপিজেডে একটি বিদেশি ফার্মের ডিরেক্টর। কোরিয়া থেকে বাংলাদেশে এসে বিনিয়োগ করেছেন। এ দেশের অবকাঠামো বিনিয়োগের উপযুক্ত মনে হয়েছে। মানুষেরা খুব ভালো।  কাজের প্রতি আন্তরিক। ইপিজেড ট্র্যাক্স ফ্রি এলাকা হওয়ায় ভালো ব্যবসা হচ্ছে। তার কথা শুধু শুনেই গেলাম। নিজের কথা কিছুই বলা হলো না। বিদেশিনীকে রিকশায় উঠিয়ে দিলাম। তিনি চলে গেলেন খুলশি আবাসিক এলাকার দিকে। আমি চললাম আমার বাসার দিকে।

এর দুই মাস পরের কথা। চট্টগ্রাম ইপিজেডের ইয়াংওয়ান গ্রুপের একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়লো। তারা লোক নেবে। ডিপার্টমেন্ট সেলস। যোগ্যতা চাচ্ছে এমবিএ। আমার তো এমবিএ  ডিগ্রি নেই। আমি নরমাল মাস্টার্স। তাও অ্যাপিয়ার্ড মাত্র। যোগ্যতায় আমি আসি না। তবু ভাবলাম লাক ট্রাই করে দেখি। অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছি ডাকের।

অবশেষে আমার অবাক হওয়ার পালা শুরু হলো। আমার ইন্টারভিউ দেয়ার ডাক এলো। দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলাম ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে। আমার অবাক হওয়ার দ্বিতীয় পর্ব এখান থেকে শুরু হলো। ইন্টারভিউ বোর্ডে পাচজন সদস্য। তার মধ্যে বসে আছেন আমার সেই ছাতা ধরা বিদেশিনী। মুহূর্তেই বুকে সাহস চলে এলো। কিন্তু তিনি আমাকে চিনেও না চেনার ভান ধরলেন। কঠিন প্রশ্ন করলেন। কিছু উত্তর দিতে পারলাম আর কিছুর উত্তর পারলাম  না।  শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার তো এমবিএ নেই। চাকরিটা আমি আদৌ করতে পারবো কি না।

খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বললাম যে, আপনারা সহযোগিতা করলে কাজটা অবশ্যই করতে পারবো।

কতোটুকু কি পারলাম বুঝিনি। তবে চাকরি যে আমার হবে না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম। একটার পর একটা অ্যাপ্লিকেশন ছেড়েই যাচ্ছি। কিন্তু কোথাও কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। প্রচণ্ডভাবে  হতাশ হয়ে পড়েছি।

এবার আমার অবাক হওয়ার তৃতীয় পর্ব শুরু হলো। কুরিয়ার সার্ভিসের লোক এসে একটি খাম দিয়ে গেল। এসেছে ইয়াংওয়ান গ্রুপ থেকে। সে আমার চাকরি পাওয়ার খবরটা নিয়ে এসেছে। পরের মাস থেকে জয়েনিং। খুব ভালো বেতনের চাকরি। খাটুনিটা একটু বেশি আর কি।

জয়েন করে ফেললাম। সেই চাকরিতে এখনো আছি। পরে জেনেছিলাম যে অনেকগুলো যোগ্য প্রার্থী থাকার পরও শুধু বিদেশিনীর আগ্রহে আমাকে নেয়া হয়েছিল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, চাকরি পাওয়ার পেছনের রহস্যটি হলো সেদিনের সেই ছাতা ধরার ঘটনা।

*শুল্ক বহর, চট্টগ্রাম থেকে*

## হজ যাত্রায়

**- - আঞ্জুমান আরা আহমেদ**

পবিত্র হজের প্রস্তুতি নিচ্ছি–অভিজ্ঞ হাজিরা উপদেশ দিচ্ছিলেন কি কি সঙ্গে নেবো সে সম্পর্কে। তখন শুনলাম ছাতা নিতে হবে না। কারণ ব্যালটি হাজিদের বাংলাদেশ বিমান ছাতা দেবে। প্লেনে উঠার সময় বিমান থেকে সবাইকে ছাতা দেয়া হলো শাদা ছাতা বাংলাদেশের পতাকা আকা। আর এ ছাতারই কাহিনী লিখছি।

মক্কায় একদিন কেনাকাটার জন্য দোকানে যাচ্ছি, রাস্তায় চলছে অসংখ্য গাড়ি। কিন্তু পথচারী খুব একটা নেই। হঠাৎ কোথা থেকে এক খাকি পোশাক পরা লোক পাশে এসে আমার স্বামীকে বললেন, চিঠিটা পড়ে দেবেন?

আমরা অবাক! বললাম, কি করে বুঝলেন আমরা বাংলাদেশি?

লোকটি বললো, ছাতা দেখে।

জানলাম লোকটি লেখাপড়া জানে না শুধু নাম সই করতে পারে। মক্কায় সে ঝাড়ুদারের কাজ করে। আমার মনে হলো চিঠি পড়ানোটা উছিলা মাত্র। সে এসেছিল আমাদের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু বেশিক্ষণ কথা বললো না। কারণ সুপারভাইজাররা সব সময় খেয়াল রাখে কেউ কাজ ফাকি দিচ্ছে কি না। ছাতার পরিচয়ে মক্কা–মদিনায় বাংলাদেশি ট্যাকসি ড্রাইভাররা বিনা ভাড়ায় বা নামমাত্র ভাড়ায় বাংলাদেশি হাজিদের গন্তব্য স্থানে পৌছে দেয়। ছাতার সুবাদে মক্কা, মদিনা মিনায় কর্মরত বাংলাদেশিরা আমাদের অনেক সাহায্য করেছে।

সব দেশের বিমানই তাদের দেশের হাজিদের ছাতা দেয়। সব ছাতাই শাদা এবং সেই দেশের পতাকা আকা। কেবল পাকিস্তানের পতাকা হালকা সবুজ রঙের।

কাবা শরিফে যাবার সময় ছাতা নিয়ে যেতাম। অসুবিধা হতো নামাজের সময়। ছাতাটা সামনে রাখলে দুই পাশের নামাজিদের অসুবিধা হয়, পাশে রাখলে পেছনের নামাজিদের অসুবিধা হয়। শেষে কাবা শরিফে বা অন্য কোনো মসজিদে যাবার সময় কখনো ছাতা নিতাম না।

ছাতা মানুষকে রোদ বৃষ্টি থেকে বাচায়। কিন্তু মক্কায়-মদিনায়, আরাফাতে হজের সময় ছাতা দিয়ে আরেকটি কাজ হয়। হজের সময় মক্কা-মদিনার ব্যবসীরা, ধনী লোকেরা পানির প্যাকেট, দুধের প্যাকেট, জুস ইত্যাদির প্যাকেট বিতরণ করে। এগুলো তারা সাধারণত ট্রাক থেকে ছুড়ে দেয় এবং হাজিরা প্যাকেট ধরার জন্য ছোটাছুটি করে। কিছু কিছু হাজি ছাতা উল্টো করে ধরলে প্যাকেট ছাতায় এসে পড়ে।

হজের তিন চার দিন পরে একদিন কাবা শরিফ থেকে হোটেলে ফিরছি। পথে খাবার কেনার জন্য এক দোকানে দাড়িয়েছি। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ বলে উঠলো, বাবা শোনেন।

আমার স্বামী এবং আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি এক অশীতিপর বৃদ্ধ আমার স্বামীকে ডাকছেন। বুঝলাম এটাও ছাতার কাজ।

ভদ্রলোক বললেন, তিনি তার সহযাত্রীদের হারিয়ে ফেলেছেন এবং তার হোটেল খুজে পাচ্ছেন না। কোন হোটেলে থাকেন জিজ্ঞাসা করতেই জানলাম তিনি আমাদের হোটেলে থাকেন। তিনি আমার স্বামীর পাঞ্জাবি ধরে পেছন পেছন এলেন। হোটেলে ঢুকতেই দেখি ওনার সহযাত্রীরা ওনাকে হারানোর জন্য একে অন্যকে দোষারোপ করছেন। আমরা ওনাকে নিয়ে এসেছি বলে আমাদের ধন্যবাদ দিলেন। ছাতার একটি বিশেষ গুণ আছে তা হলো, হারিয়ে যাওয়া। তাই আমাদের একটি হাজি ছাতা হারিয়ে গেছে। কিন্তু অন্যটি এখনো আমাদের হজের স্মৃতি বহন করছে।

*উত্তরা, ঢাকা থেকে*

## গোল তো হুয়া

**- - আশরাফ উদদীন আহমদ**

অবসর প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা আমার বাড়িওয়ালা খালুজান প্রায় প্রতিদিনই সকালে আমার দোকানে এসে বসবেন। এটা এখন সর্বজনবিদিত। পত্রিকা পড়ার মাঝে চা-বিস্কিট চলে। ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে নানান সওদাপাতি কেনাটা তিনি এখানে বসেই সারেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খালুজান বৃটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। এই সুবাদে পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরে দেখার সৌভাগ্য তার হয়েছে। দেশ বিদেশের অনেক মজার ঘটনা খালুজানের কাছে আমরা একাধিকবার শুনেছি। আজকের ঘটনাও আমার সেই শ্রদ্ধেয় খালুজানের কাছে শোনা।

দেশ বিভাগের আগেও উপমহাদেশে ফুটবল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা ছিল। একদিন জনপ্রিয় *মোহামেডান* ও *মোহনবাগান*–এর খেলা ছিল ইডেনের মাঠে। দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ সে খেলাতে খালুজানের পাশে বসেছিল এক মাড়োয়ারি। তার হাতে ছিল নতুন ছাতা। মোহামেডান সমর্থক সে মাড়োয়ারি মোহনবাগান গোলমুখে তার প্রিয় দলের হামলার সময় স্ট্রাইকারের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিশিয়ে ছাতা দিয়ে গ্যালারিতে ঠুকছিল আর গোল–গোল–গোল করছিল। গোল যখন হয়েই গেল তখন ভদ্রলোক *গোল* বলে চিৎকার দিয়ে ছাতা হাতে সজোরে মারলো এক বাড়ি। ফলাফল যা হবার তাই। ছাতা ভেঙে দুই টুকরো। মাড়োয়ারির সেদিকে হুশ নেই। অনবরত *গোল গোল* চিৎকার দিয়ে চলছে। এই দেখে পাশের এক ভদ্রলোক মাড়োয়ারির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে, *আরে সাব, এ কেয়া, আপকা ছত্তি তো টুট গিয়া।*

আর কথা নেই। মাড়োয়ারি রেগে আগুন, *ছাত্তি টুট গিয়া তো কেয়া হুয়া, তোমহারা বাপকা শের টুট গিয়া ? শালা বান...। ছাত্তি টুট গিয়াত কেয়া হুয়া..., গোল তো হুয়া* বলে ভদ্রলোকের সঙ্গে সেকি ঝগড়া।

*ঢাকা থেকে*

## টিকটিকি

### - - সেমন্তি

এক.

ছোটবেলায় একবার আমার পড়ার টেবিলে টিকটিকি দেখে ভয়ে সেখানেই ফিট হয়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং বুঝতেই পারছেন টিকটিকি দেখে কি পরিমাণ ভয় পাই। তবুও কেন জানি এই হতভাগা আমার পিছু ছাড়ে না। অনেক জায়গায়, অনেকভাবে এই ছোট প্রাণীটির আক্রমণের শিকার হয়েছি। অর্থাৎ যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়।

আমাদের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা ১০টার সময়ে শুরু হবে। কিন্তু আমি আবার অনেক আগে থেকেই হলে গিয়ে বসে থাকতাম। সেদিন ছিল জীববিজ্ঞান পরীক্ষা। ৯টার সময়ে বাসা

থেকে বের হবো হবো ঠিক এমন সময়ে বৃষ্টি শুরু হলো। ১৫ মিনিট পর বৃষ্টি কিছুটা হালকা হলো। ভাবলাম, ছাতা নিয়ে বের হই। তো বের হতে হতে বৃষ্টি থেমে গেল। তবুও ছাতা নিয়েই গেলাম। পরীক্ষা শেষ। কিছুক্ষণ আগে থেকেই হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। বের হবো হল থেকে। ছাতা খুললাম। হঠাৎ যমদূতের মতো ছাতা থেকে বেরিয়ে এলো আমার প্রিয় টিকটিকি। ব্যাস, এক চিৎকারে আগের মতো ফিট। এরপর থেকে সেই ছাতাটা দেখলেই আমার ভয় লাগে যদি হঠাৎ সেখান থেকে আবার টিকটিকি হাজির হয়! ছাতাটাও পর হয়ে গেল।

দুই.

ছোট ভাইয়া ছোটন অনেকক্ষণ ধরে ঘুর ঘুর করছে। তাকে ছাতা আকানো শেখাতে হবে। বসে গেলাম চাদা, স্কেল নিয়ে। একে দিলাম। খুব খুশি। আকা শিখে গেছে। নিজেকে খুব বড় মনে হচ্ছিল।

পরদিন সকালে দেখি আমার খাতা, বই, আমাদের ঘরের মেঝে, দেয়াল বিভিন্ন জায়গায় অনেক রকম ছাতা গজিয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ছোটনের কাজ। নতুন নতুন শিখলে যা হয়। নতুন বিপদে পড়লাম। হায়রে ছাতা!

*বালিয়া হালট, পাবনা থেকে*

## স্বামী

**-- অপরাজিতা**

শ্বশুরবাড়িতে প্রথম সকাল আমার। শাশুড়ি দুটো ডিম সিদ্ধ করে বাটিতে করে আমার হাতে দিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে বললেন। ঘরে টেবিলে বাটি রাখতেই আমার স্বামী বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসে ডিমের খোসা ছাড়াতে লাগলেন। আমি চামচ, পিরিচ, লবণ এনে বসলাম। তিনি নির্বিঘ্নে ডিম দুটির খোসা ছাড়িয়ে খেয়ে নিলেন। আমার প্রত্যাশায় ব্যাঘাত ঘটলো। আমাদের পছন্দের বিয়ে, অতএব...।

পাকিস্তান পিরিয়ডে আমার শাশুড়ি, ননদ, দেবর, ভাগ্নে–ভাগ্নি মিলে পনেরো ষোলজন আমার বাবার বাড়িতে এলেন। তিন দিন থেকে তারা ভালোভাবে বুঝলেন আমার বাবার আর্থিক সঙ্গতি। কাজেই ঠিক বাড়ি ফেরার আগের রাতে রাত বারোটার পর স্বামী আমাকে আদেশ করে বললেন, তোমার বাবা যেন এক হাজার টাকা আম্মাকে দিয়ে দেন।

কয়েকদিনে গরু, খাসি, মুরগি, দই, মিষ্টিসহ বাবার খরচ অনুমান করে এতো রাতে এতোগুলো টাকার কথা বাবাকে বলতে অস্বীকৃতি জানালাম।

তিনি গর্জে উঠলেন। বাবার জন্য খুব দরদ? বলেই লাথি মারলেন আমাকে।

আমি তখন আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আচমকা লাথি খেয়ে মশারিতে বেধে পড়ে গেলাম মাটিতে। আমার মাথায় রক্ত উঠলো। উঠে দাড়িয়ে দরজার খিল খুলতে খুলতে বললাম, আজ আমার সন্তানের কোনো ক্ষতি হলে কাল সকালে প্রাণ নিয়ে তোমরা কেউ ফিরে যেতে পারবে না এ গ্রাম থেকে।

ভয় পেয়ে দ্রুত এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করে বললেন, এ কথা তার নিজের নয়, মা–বোনদের।

আমি বিশ্বাস করলাম। পরদিন সকালে তারা চলে গেলেন। আমার যাওয়ার কথা থাকলেও আমাকে যেতে বললো না কেউ। আমার ডেলিভারি হবে রাজশাহী মেডিকালে। কারণ আমি তখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। আপনা থেকেই পরবর্তী কালে বাবা আমার খরচ ছাড়া বাড়তি এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন আমার শাশুড়িকে দেয়ার জন্য।

এক বিভাগীয় শহরে আমার চার মাসের ছেলেকে নিয়ে ভাড়া থাকি। একটা থিসিস পেপারের জন্য মাঠে কাজ করছি। বাচ্চা বুকের দুধ খায়। কাজেই সন্ধ্যায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। একজন বুয়া রান্নাবান্না করে, বাবুকেও রাখে। বুয়া রাতে উপর তলায় বাড়িওয়ালার ঘরে ঘুমায়। আমার ঘরটি বিশাল। দুই পাশে দুটি খাট। আমাকে সারা রাত এখাট–সেখাট করতে হয়। স্বামী ডাকলে তার কাছে, সন্তান কাদলে তার কাছে।

এক রাতে বাবুকে খাওয়াতে খাওয়াতে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছি। আমার স্বামীর পা টিপে না দিলে ঘুম আসে না। সে প্রচণ্ড রেগে এসে আমার চুলের মুঠি ধরে বিছানা থেকে টেনে তুলে বললেন, হারামজাদি, আমার চেয়ে ছেলেকে বেশি ভালোবাসিস, তাই না? জবাব না দিলেও এই মুহূর্তে আমার এটাই মনে হচ্ছিল, এক নিমেষে পাষণ্ড পিতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার ছেলের এক হাত, এক পা ধরে টেনে তুলে মেঝেতে শুইয়ে দিলেন।

ছেলের ঘুম ভাঙার আগেই করুণ আর্তনাদে বিকট চিৎকার করি। বাবুও চিৎকার করে কেদে উঠলো যেন বললো, মা কেদো না, আমিও তোমার সঙ্গে রয়েছি। আমি তাকে বুকে তুলে চেপে ধরলাম। সে চুপটি করে রইলো। তার বাবা গালি দিচ্ছে।

আমাদের মা–ছেলের চিৎকারে সবাই উপর থেকে নিচে নেমে এসে দরজায় টোকা দিল। আমার স্বামী অনুনয় করে আমাকে বললেন যেন কাউকে কিছু না বলি। নিজেই দরজা খুলে পাল্টা প্রশ্ন করলেন বাড়িওয়ালিকে, কি হয়েছে এতো রাতে দরজা নক করলেন কেন?

বাবুকে বুকে চেপে ধরে ঘরের এক কোণায় আমি দাড়িয়ে। তারা সব বুঝলেও নিরুপায় হয়ে উপরে চলে গেল।

এরপর দেশ স্বাধীন হলো। আমার স্বামী মুক্তিযুদ্ধ করে ফিরে এসে ভালো চাকরি পেলেন। আমরা ঢাকায় এক বস্তি এলাকায় কম ভাড়ায় বাসা ভাড়া নিলাম। এখানে অন্য সব বাসিন্দাদের ভিড়ে আমি মিশে গেলাম। ভাব হলো তাদের সঙ্গে। তারা সবাই আমার স্বামীর নির্যাতনের কথা জানতে পেরে নিজেরা ঠিক করলো, যখন আমার স্বামী আমাকে মারবে তখন তারা দল বেধে এসে দরজায় নক করে ডাকবে। একদিন তাই করলো। আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে দরজার কাছে গিয়ে এমন বিশ্রী ভাষায় গালি দিল যে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। পরে এ নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়েছে। পুরুষ মানুষের মুখ এমন খারাপ কেউ নাকি শোনেনি।

আমার ছেলেমেয়েরা এখন দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা পেয়েছে। আমরা দুজনে প্রথম গ্রেডের চাকরি করি। আজো আমার স্বামী আমাকে তেড়ে মারতে আসে। আমাকে তালাক দিতে চায়। বাসা থেকে চলে যেতে বলে।

কেমন করে যাবো আমি? আমার ঘরে যে বিয়েযোগ্য কন্যা? ঘর ছেড়ে গেলে মেয়ের বিয়ে দেবো কেমন করে? স্বামী যে মাথার ছাতা!

দুঃখ হয়, আমি সামান্য একজন নাগরিক। কিন্তু আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কি হবে? তার যে মাথার ছাতা হারিয়ে গেছে। গত নির্বাচনে এ দেশের মানুষ ছাতাহারাকে ঠিকই চিনেছে।

*কাওরানবাজার, ঢাকা থেকে*

## মহিষ বিপত্তি

–– **মোহাম্মদ শফিউর রহমান**

ছাতা নিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে আমার শৈবের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ১৯৬৩ সাল। আমি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বয়স আট বছর। এ সময়ে আমরা সংসারে ছিলাম আব্বা আম্মা ছাড়াও তিন ভাই ও তিন বোন। তখন উত্তরবঙ্গের বেশির ভাগ রাস্তা ছিল কাচা। মফস্বলে দ্রুত গতির বাহন ছিল

টমটম বা ঘোড়ার গাড়ি। মালামাল এবং মানুষ পরিবহনের জন্যও গরু ও মহিষের গাড়ির ব্যাপক ব্যবহার হতো।

আমাদের বৈদ্যনাথপুরের বাড়ি থেকে নানার বাড়ি বড়াইগ্রামের লক্ষ্মীকূলের দূরত্ব প্রায় ৩০ মাইল। মাটির এ রাস্তা একটু বর্ষায় কর্দমাক্ত হয়ে পড়তো। তখন সাইকেল বা ঘোড়ার গাড়িও চালানো কষ্টসাধ্য হতো। গরু বা মহিষের গাড়ি এ সময়ে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া বেশি লোড নিয়ে দীর্ঘ যাত্রায় মহিষের গাড়িতে ছই লাগিয়ে রওনা হতাম নানা বাড়ির উদ্দেশ্যে। যাত্রাকালে হারিকেন, হাতপাখা, রান্না করা খাবার, জগ, গ্লাস, মহিষের খাবার হিসেবে খড় ইত্যাদি নিয়ে রওনা হতাম। যাত্রা শুরুর আগেই মহিষ দুটোকে ভালো করে খাইয়ে নেয়া হতো।

নানা বাড়িতে মহিষের গাড়িতে যাত্রা পথে বনপাড়া পার হওয়ার কিছু পরে মধ্যহ্ন ভোজ শেষে আমরা আবার রওনা দিই। এ বছর আমার মামাতো ভাই ফরহাদ এসেছিলেন আমাদের বাড়ি বেড়াতে। তখন দুপুরের অত্যধিক গরমে বড়ভাই, মেজভাই এবং ফরহাদভাই গাড়ির আগে আগে হেটে রওনা দেন। আমি গাড়ির ছই–এর বাইরে গাড়োয়ানের পেছনে এক হাতে ছই ধরে আরেক হাতে গ্লাসে পানি নিয়ে পান করছিলাম। সহসা মহিষগুলো প্রাণভয়ে দৌড় দেয় এবং আমি গাড়ি থেকে মাটিতে পড়ে যাই। আমার হাতের ওপর দিয়ে গাড়ির কাঠের চাকা চলে যায়। আমি পড়ে থাকা অবস্থায় বড়ভাই আমাকে টেনে তোলেন।

আমার বাম হাতের ওপর দিয়ে চাকা যাওয়ায় সেখানে বেশ ফুলে উঠলো। আম্মাজি তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হোমিওপ্যাথ ওষুধের বাক্স থেকে এক ডোজ আর্নিকা দিলেন এবং বড়ভাই গামছা ভিজিয়ে হাতে জড়িয়ে দিলেন। পরবর্তী কালে রাত নাগাদ লক্ষ্মীকূলে নানার বাড়ি পৌছাতে হাতে ব্যথা কমে গেল।

মহিষগুলো সহসা দৌড় দেয়ার কারণ কি তা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময় নানা বাড়ি পৌছা পর্যন্ত গবেষণা চললো। সব তথ্য সংগ্রহের পর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে সবাই মিলে এই সিদ্ধান্তে পৌছা গেল যে, ফরহাদভাইয়ের হাতে একটা ছাতা ছিল। তিনি সেটা হাতে নিয়ে গাড়ির আগে আগে চলার সময়ে মহিষের খুব কাছে গিয়ে হঠাৎ ছাতাটা খুলেছিলেন এবং এতে ভয় পেয়ে মহিষ দৌড় দিয়েছিল। ফলে আমি দুর্ঘটনা কবলিত হই। অবশ্য ফরহাদভাই বলেছিলেন যে, আমি বসে না থেকে দাড়িয়ে কেন পানি পান করছিলাম? বসে থাকলে এটা ঘটতো না।

*গৃন রোড, ঢাকা থেকে*

**টোপ**

- - মারুফ সেজান

ছাতা নিয়ে বড্ড ধকল গেছে শিশু বয়সে। বাবা নতুন ছাতা কিনে দিয়েছেন। স্কুলে নিয়ে তা আর কখনো ফেরত আনতে পারিনি। এমন অবস্থায় পড়েছি কম করে হলেও ডজন দেড়েক। তাই ছাতা ভীতি, কখন হারিয়ে ফেলি। নাক খত দিয়ে ছাতা নামক জিনিসটি থেকে দূরে থেকেছি। তবুও ছাতা আমায় ছাড়েনি। শেষবার ছাতা না হারালেও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

১৯৯১ সাল। এক বাদল দিনে ভাগ্নি কান্না জুড়ে দিল আলাউদ্দিনের ছানার মিষ্টি খাবে। আপা অনেক বুঝিয়েও ভাগ্নিকে থামাতে না পেরে টাকা আর ভীতিজনক ছাতাটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যাও, আলাউদ্দিনের মিষ্টি এনে ভাগ্নিকে ঠাণ্ডা করো।

ছাতার হাত থেকে বাচার লক্ষ্যে ব্যালকনিতে এসে উকি মারি রিকশার প্রত্যাশায়। কিন্তু না, রাস্তা ফাকা। কি আর করা। ছাতা নিয়েই বের হতে হলো মগবাজার রেলগেটের বাসা থেকে আউটার সার্কুলার রোডের আলাউদ্দিন সুইটমিটের উদ্দেশ্যে। নির্বিঘ্নেই পৌছে গেলাম।

দোকানটিতে জনাদশেক পুরুষ মহিলা এপাশ–ওপাশ করছে। মিষ্টি কিনে ছাতাটা মেলে দিয়ে যেই না ফুটপাথে পা দিয়েছি তখনই এক ভদ্রমহিলার মিষ্টি মধুর আওয়াজ, এই যে ভাই, তুমি কোথায় যাবে? কি বললো কথাটা বুঝতে না পারলেও গন্তব্যের কথা বলামাত্রই এক ত্রিশোর্ধ মহিলা ছাতার তলে এসে বললেন, আমাকে একটু লিফট দাও। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি, কোনো রিকশা পাচ্ছি না।

ভাগ্নির বেবি ছাতা, আসার সময় নিজেই ভিজে একাকার, সেখানে মহিলাকে লিফট দেবো কিভাবে সাত পাচ ভাবছি। তারপরও বললাম, কোথায় যাবেন?

এই তো তোমার পথেই, ওয়ারলেস রেল গেটের কাছে।

আমার হাবভাব অনুধাবন করে দুই চারজন ভদ্রলোক অনুরোধ করলো, আপনার পথেই তো, একটু কষ্ট হলেও লিফট দিন।

কি আর করা? ঢেকি গেলার মতো ভদ্র মহিলাকে লিফট দিতে হলো।

বেসুরো বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। রাস্তায় হাটু পানি। গাড়ির সংখ্যা একদম কম। ফুটপাথ প্রায় ফাকা। সেঞ্চুরি আর্কেড পর্যন্ত ভালোভাবেই এলাম। এরপরই হলো বিপত্তি। পড়ে যাবার উছিলায় মহিলাটি আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তার বুকের নরম পিণ্ড আমার পিঠে আছড়ে পড়লে ২২ বসন্তের দেহটি শিহরিত হলো। মহিলাটি আমায় জড়িয়ে হাটছে, ছাড়ার লক্ষণ নেই। পিঠে নরম পিণ্ডের ছোয়ার সঙ্গে গরম নিঃশ্বাসের দোলা লাগতে শুরু করলো।

এদিকে বৃষ্টির তীব্রতা বেড়ে গেল। দুটো মাথা বাচলেও সব ভিজে জবুথবু। অবশেষে মহিলার দোরগোড়ায় পৌছে গেলাম। নিজ গন্তব্যের লক্ষ্যে পা বাড়ানোর সদিচ্ছায় বিদায় পর্বে এগোতেই রহস্যময়ী এক মুচকি হেসে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, একটু বসে যাও ভাই, তাড়া তো নেই। কমলেই না হয় যেও।

কি এক মায়াজালে ভাগ্নির কান্নার কথা ভুলে মহিলাকে অনুসরণ করে দোতলায় উঠে এলাম।

বাইরে থেকে দরজার লক খুলে ছিমছাম এক ড্রইং রুমে প্রবেশ করেই মহিলা লিনা, রুবি বলে চিৎকার জুড়ে দিল। ডাক শুনে লিনা নামের এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ছুটে এলো। মেয়েটির পোশাকের বহরে শর্টস আর হাতাকাটা গেঞ্জি। বুকের মাংসপিণ্ড গেঞ্জি ফুলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। চোখে সর্ষে ফুল দেখার উপক্রম।

মহিলা লিনাকে বললো, এ ভাইটি আমাকে লিফট দিয়েছে। কিন্তু নিজে ভিজে একাকার। রুমে নিয়ে তাকে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দাও। শার্ট প্যান্ট শুকানোর ব্যবস্থা করো। ভাইটির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই লিনা নামের মেয়েটি তার বুক কাপিয়ে এক ভুবন মোহনীয় হাসি দিয়ে বললো, আসুন।

এতোক্ষণ ঘোরের মাঝে বিচরণ করলেও মেয়েটির ডাকে সংবিৎ ফিরে পেয়ে অনুভব করলাম, কোনো ঘেরাটোপের বেড়াজালে আটকে গেছি। তবুও সুবোধ বালকের মতো লিনা নামের মেয়েটিকে অনুসরণ। ছাতাটা ড্রইং রুমেই রয়ে গেল। সাজানো গোছানো বেড রুম। পর্দা দিয়ে ঘেরা। পুরো রুমে লাইটের গোলাপি আভা।

চেস্ট ড্রয়ার থেকে একটি বড়সড়ো তোয়ালে বের করে মেয়েটি আমার সামনে দাড়ালো। আমার ভেজা শার্টটা নিপুণ হাতে খুলে নিল। একটি প্লাস্টিক চেয়ার এগিয়ে বসতে বলায় সম্মোহিতের মতো এগিয়ে দেয়া চেয়ারটিতে বসে পড়লাম। লিনা তথা মেয়েটি তোয়ালে দিয়ে মাথা, শরীর মুছতে শুরু করলো। এমনভাবে মুছছিল যে, তার বুকের মাংসপিণ্ডের খোচা পিঠে, মুখে বিদ্ধ করছে। তোয়ালে রেখে প্যান্টের হুকে হাত বাড়ালো। বাধা দেয়ায় বললো, প্যান্ট ভেজা, এটা খুলে দিন। লজ্জা করলে তোয়ালেটা না হয় পরুন। এতো লজ্জা করছেন কেন? একটু পর তো লজ্জার কথা মনে থাকবে না, তখন তো...।

মেয়েটির কথায় মাথা ঝিম ঝিম করে উঠলেও আবারও সম্মোহিতের মতো তোয়ালেটা জড়িয়ে প্যান্টটা খুলে ফেললাম। বিছানায় বসতে বলে সেই ভুবন মোহনী হাসি ছড়িয়ে জানতে চাইলো, ঠাণ্ডা কাটাতে কফি না বিয়ার খাবেন?

কিছু লাগবে না বলাতে একটু রহস্যময়ী হাসি দিয়ে এগিয়ে এলো মেয়েটি। নিমেষেই আমার মাথাসহ মুখটা তার বুকের মাংসপিন্ডের মাঝে চেপে ধরলো। আস্তে আস্তে তার ঊর্ধ্বাংশ উন্মুক্ত হলো। চোখ মেলে মেয়েটির উন্মুক্ত বুকের পিণ্ডগুলো দেখে ২২ বসন্তের এই আমার মতিভ্রম ঘটে গেল। হাত সঞ্চালিত হলো মাংসপিণ্ডের মাঝে। তোয়ালেটা উধাও হলো। এরপর...। বিপথে পা ফেললাম, না ধর্ষণের শিকার হলাম বুঝতে ব্যর্থ হলাম।

ঘণ্টা দুই পর লিনা তথা মেয়েটির বাড়িয়ে দেয়া শার্ট প্যান্ট পরে বেরিয়ে আসতেই ড্রইং রুমে বসা ভদ্রমহিলা আমার ছাতাটি এগিয়ে দিয়ে, মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে উঠলেন, কেমন মজা হলো? লিনাকে কি পছন্দ হয়েছে? বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এসো মাঝে মাঝে। আরে ভাই, আমরা তো আছি তোমাদের খেদমতে!

মহিলার সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে বৃষ্টির তীব্রতা না কমলেও গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ঘেরাটোপের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এলাম।

শেষবার শিশু বয়সের মতো ছাতাটা না হারালেও নিজের পবিত্রতা এবং প্যান্টের পকেটে রাখা মানিব্যাগসহ প্রায় সাড়ে ছয়শ টাকা হারিয়ে ফেললাম। ছাতা আমার জীবনে এক অপয়া জিনিস। তাই ছাতা দেখলেই এখন আতকে উঠি।

*কাজীবাধা, রাজবাড়ী থেকে*

## লজ্জা

**- - সেহেলী আছাদ রুবী**

আম্মুর বকাবকিতে স্কুলে একবার ছাতা নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বান্ধবী সীমা এসে আমাকে বললো, কিরে, আজ যে গ্রামের বরদের মতো ছাতা মাথায় দিয়ে এসেছিস! হেটে এসেছিস নাকি?

ক্লাসে সে ভীষণ খেপিয়েছিল আমাকে। সেদিন সীমার কথায় ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম। সেদিন থেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কখনো ছাতা ব্যবহার করবো না। কিন্তু ছাতা যে একজন মানুষের জীবনে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সেটা অনুভব করলাম আরেকদিন। আমি তখন সরকারি পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছি। রবিবার আমার বাংলা

দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা অথচ তার আগের রাত থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই, থামার নাম নেই। অবশেষে সকাল হলো আকাশও কিছুটা পরিষ্কার হলো।

খাওয়া দাওয়া করে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা হবো এমন সময় আম্মু বললো কখন বৃষ্টি হবে বলা তো যায় না ছাতাটি নিয়ে যাও।

আম্মুর কথা গ্রাহ্য না করেই বেরিয়ে এলাম রাস্তায় এবং ভাড়া ঠিক না করেই রিকশায় উঠে পড়লাম। কলেজের গেটে এসে রিকশাচালক বললো ১২ টাকা দিতে হবে।

সাত টাকার জায়গায় ১২ টাকা! আমি তো অবাক। রিকশাচালক একটা টাকাও কমালো না। শেষে ১২ টাকা দিয়েই কলেজে ঢুকলাম। তারপর পরীক্ষা শুরু হলো এবং শেষও হলো। পরীক্ষার হল থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিকে অন্ধকার মনে হচ্ছে এক্ষুণি বৃষ্টি নামবে। পরীক্ষা কার কেমন হলো এসব কথা বলতে বলতে আমরা তিন চারজন বান্ধবী হাটছি এরই মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমরা সবাই পাশের স্কুলের সামনের একটি দোকানে দাড়ালাম।

যেহেতু কমার্স কলেজ ও পাইওনিয়ার কলেজ পাশাপাশি সেহেতু সবার পরীক্ষা এক সঙ্গে শেষ হয়েছে। রাস্তায় ছেলেমেয়েরা। যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ কেউ রিকশা করে, ছাতা নিয়ে, অনেকে আবার দল ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি যাচ্ছে। প্রায় এক ঘণ্টার মতো আমরা দাড়িয়ে আছি। রাস্তাও প্রায় ফাকা হয়ে গেছে। অবশেষে বান্ধবীরাও যে যার মতো রিকশায় করে বাসায় যাচ্ছে। আমি আর সালমা দাড়িয়ে আছি। আমাদের দুজনের বাসা বানরগাতী বাজার। কোনো রিকশাচালক বানরগাতী বাজার যাবে না, যাও বা দুই একজন যেতে চাচ্ছে তারা সাত টাকার জায়গায় ২৫ থেকে ৩০ টাকা চাচ্ছে।

এখন কি করবো? বাসায় যাবো কিভাবে? এভাবে আর কতোক্ষণ রাস্তায় দাড়িয়ে থাকবো? বৃষ্টিও থামছে না। সকালে আম্মুর কথা বার বার মনে পড়ছে। আম্মু আমাকে ছাতা নিতে বলেছিলেন। শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম বৃষ্টিতে ভিজে বাসায় যাবো। পাইওনিয়ার কলেজ থেকে বানরগাতী বাজার পর্যন্ত তো কম দূর নয়, এতো দূর হাটাও সম্ভব নয়। তাই আমি আর সালমা বৃষ্টির মধ্যে হাটছিলাম এবং রিকশা খুজছিলাম।

দুজনেরই ভীষণ লজ্জা লাগচ্ছিল। কারণ বৃষ্টির মধ্যে দুটি মেয়ে রাস্তায় হাটছে। তারপর সিটি কলেজের সামনে একটা রিকশা পেলাম। রিকশাচালক ১৫ টাকা ভাড়া চাইলো। অগত্যা ১৫ টাকা ভাড়া দিয়েই রিকশায় উঠলাম। সালমাকে তাদের বাসায় নামিয়ে দিয়ে বাড়ি এলাম। যখন বাড়ি এলাম তখন ঘড়িতে বাজে পৌনে চারটা।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীর ভেজা দেখে আম্মু অনেক বকা দিলেন বললেন, সকালে ছাতা নিতে বলেছিলাম, তখন তো খুব লজ্জা লাগছিল আর এখন এভাবে বৃষ্টিতে ভিজে রাস্তা দিয়ে হেটে এসেছো, এখন লজ্জা লাগেনি?

আমি কোনো কথা না বলে নিজেকেই মনে মনে বকা দিলাম, সত্যিই তো, একটা ছাতা থাকলে আজ এমন লজ্জায় পড়তে হতো না। সেদিন সালমার কি অবস্থা হয়ে ছিল তা জানতে পারিনি। পরে অবশ্য শুনেছিলাম সালমাকেও তার আম্মু অনেক বকেছেন।

*খুলনা থেকে*

## ভানু বন্দোপাধ্যায়ের বিজ্ঞপ্তি

### হারুন ফেরদৌসী

তখনো কলকাতায় সাধারণ মানুষ ও উচ্চবিত্ত মানুষ সবাই ট্রাম এবং বাসেই যাতায়াত করতেন। ভানু বন্দোপাধ্যায় নিয়মিত ট্রামের নির্দিষ্ট রুটে টালিগঞ্জ যাওয়া-আসা করতেন শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায়। সে বছর বর্ষার সময় ভানু মোট চারবার ছাতা হারিয়ে ফেলেন এবং নিশ্চিত হন যে, ট্রামেই যাওয়া আসার সময় তার শেষ ছাতাটি খোয়া গেছে বা অন্য কেউ নিয়ে গেছেন।

এক বর্ষায় চারটে ছাতা হারানোয় ভানু বিমর্ষ ও স্ত্রীর ভর্ৎসনায় জর্জরিত হয়ে ভাবতে থাকলেন কি করা যায়। রবিবার বিকেলের চা ও সিগারেট শেষ করার পর ভানুর ললাট-রেখা কিছু প্রসারিত হলো এবং মুখমণ্ডলে প্রশান্তির ছায়া পেলেন। বাসা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় স্ত্রীকে শুধু বললেন, জীবনে যতো ছাতা হারিয়েছি তার চেয়ে বেশি ফিরিয়ে আনবো আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে।

ভানুর স্ত্রী অবাক চোখে তার স্বামীর পরিবর্তিত চেহারা ও কণ্ঠে আস্থা দেখলেন, শুনলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, বোধহয় তিনি ছাতা হারানোর চেয়েও উদ্ভট কিছু করতে উদ্যোগী হয়েছেন। রাতে ভানু ফিরে এলেন। বিশেষ কথাবার্তা বললেন না। সোমবার যথারীতি কাজে গেলেন এবং ফিরেও এলেন। কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটলো না। বরং ভানুকে একটু চিন্তিতই মনে হলো।

মঙ্গলবার সকালে শ্রীমতি ভানু ঘরের সামনের দরজা খুলে হতবাক। বাসার সামনের উঠোনে একরাশ ছাতা পড়ে রয়েছে। কমপক্ষে আশি-নব্বইটা হবে। বিভিন্ন রকমের ছাতা, কাঠের ডাটিওয়ালা, স্টিল ডাটিওয়ালা, বন্ধ ও ছোট করা যায় এমন কালো, ফুল ফুল নানান কিসিমের। চিৎকার করে কর্তাকে ডেকে তুললেন। কইগো, ওঠো, ওঠো, তোমার কথা ফলে গেছে। আমাদের উঠোনে শুধুই ছাতা আর ছাতা। কি করে এ অসম্ভবকে সম্ভব করলে তুমি!

ভানু হাই তুলতে তুলতে বললো, *কইছিলাম না জীবনে যতো ছাতা হারাইছি সব আনুম আর আরো বেশি আনুম, তুমি তো বিশ্বাসই করলা না।*

আশপাশের বাড়ির লোকজনও উৎসুক হলো কি ব্যাপার, কিভাবে এলো এতো ছাতা! ভানু ব্যাখ্যা করলেন। প্রতি বছরই বর্ষায় তার একটা দুটা ছাতা হারায়। এবার হারালো চারটি। বর্ষার এখনো বাকি এক মাস। বৌ–এর বকাঝকা শুনে বিরক্ত হয়ে ভাবতে বসলাম কি করা যায়। সারা জীবনে প্রায় ত্রিশ–চল্লিশটা ছাতা হারিয়ে ফেললাম। সত্যিই, বৌ–এর তো রাগ করারই কথা। ভেবে চিন্তে একটা ফন্দি আটলাম। রবিবার সন্ধ্যায় গিয়ে ছোট একটা বিজ্ঞাপন ছেপে দিলাম যা নিম্নরূপ :

আমি ভানু বন্দোপাধ্যায়, ১২/১ সরকার স্টৃট, গোল পার্ক, কলকাতায় থাকি এবং নিয়মিত কাজে ১২ই ট্রামে যাতায়াত করি। আমি আনুমানিক গত ৭ দিনের মধ্যে দুটি ছাতা হারিয়েছি এবং যারা এ দুটো ছাতা নিয়েছেন তাদের চিনি। যদি তারা আগামী ৩ দিনের মধ্যে এগুলো ফেরত না দেন তাহলে আগামী রবিবার এই পত্রিকায় তাদের নাম ঠিকানা ছেপে দেবো।

এতেই কাজ হয়ে গেল। এখন বুঝুন কলকাতায় বর্ষায় যারা ছাতা মাথায় চলছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছাতাটি ওনাদের নিজের নয়।

*পঞ্চগড় থেকে*

## বন্যা

**- - মোহাম্মদ লিটন তালুকদার**

১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময়। চারদিকে থই থই পানি আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি।

এই ঘটনাটি ঠিক সেই সময়কার। আমরা তখন সাভারে একতলা কোয়ার্টারে থাকতাম। কোয়ার্টারের ভেতর বন্যার পানি ঢোকায় আমরা ছাদে অবস্থান নিলাম। আশপাশের বাড়ি–ঘর ডুবে যাওয়ায় সবাই বহু দূরে নিরাপদ জায়গায় চলে গেল। এতে অবশ্য লাভ আমারই হলো। কারণ আমি আর আমার সমবয়সী মামাতো ভাই আশপাশের বাড়ির নারকেল এবং ফলমূলসহ হাস–মুরগি চুরি করে এক জমজমাট পিকনিক শুরু করে দিলাম।

হঠাৎ একদিন মায়ের দেয়া টাকা নিয়ে বাজারে যেতে লাগলাম। পথিমধ্যে আমার মামাতো ভাইয়ের প্রকৃতির ডাক এলো। আশপাশে যেদিকে তাকাই সেদিকেই অথৈ পানি। এবং টয়লেটগুলোও সব ডুবে গেছে। এমনকি যে, রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম সেখানেও হাটু পানি। মামাতো ভাই বেগ সহ্য করতে না পেরে রাস্তার পাশের ল্যাম্পপোস্টের ওপর উঠে কাপড় খুলে বসে পড়লো।

বললাম, ছিঃ, ছিঃ, একি করছিস।

সে আমার হাত থেকে ছাতাটা টান দিয়ে নিয়ে মেলে ধরলো। তার চেহারাটা ঢেকে আমাকে যা বললো তা এই রকম, শোন, সব মানুষের পেছনটা একই রকম। যদিও চেহারাটা ভিন্ন তবুও তো ছাতা দিয়ে চেহারাটা ঢেকে নিয়েছি। চেহারাটা না দেখলে কেউতো বলতে পারবে না অঙ্গটা কার কিংবা ব্যক্তিটাকে। তুই সামনে যা, আমি কাজ সেরে আসছি।

কিছু দূর গিয়ে পেছনে ফিরতেই দেখি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে কাদা আর কচুরিপানা ছুড়ে মারছে আর বলছে পাগল, পাগল।

আমি তো তখন হতবাক! আরো অবাক হলাম আবিরভাইয়া, তার স্ত্রী আর তার নব যৌবনপ্রাপ্ত শ্যালিকাকে দেখে। তারা আমাদের ঠিক পেছন থেকেই আসছিলেন। এক সময় তারা আমার কাছে এলে মামাতো ভাইকে অচেনার ভান করে তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলাম।

রসিক ভাবী মামতো ভাইকে ইঙ্গিত করে আমাকে বললেন, লোকজনের কি হয়েছে, মনে হয় লাজ লজ্জার মাথা খেয়েছে।

তাদের সঙ্গে মুচকি হেসে তাল মেলালাম।

তারা হয়তো এখানে এসেছিলেন ডুবন্ত বাড়ি-ঘর দেখতে।

খানিক বাদে তারা চলে গেলে মামাতো ভাইটাও আমার পাশে এসে দাড়ালো আর বললো, চিন্তার কিছু নেই, এই ছাতা দিয়ে সব প্রটেক্ট করেছি।

*ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে*

## দুজনার

**- - রাসেল**

সকালের এক পশলা বৃষ্টির পর জনজীবন যখন প্রাণচঞ্চল হতে শুরু করেছে তখন আমি ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরির গেটে। ফাটাফাটি এক মেয়ে দেখে বুকটা ভরে গেল, বৃষ্টি এবং নারী এসব ভাবতে ভাবতে ব্যাগ জমা দিচ্ছি। মাথায় অন্য চিন্তা। কয় তলায় গেলে মেয়েটিকে পাওয়া যাবে।

টোকেন নিয়ে ফেরার সময় দেখি নিজের টাকায় কেনা ছাতাটা পায়ের কাছে পড়ে আছে। আমার ব্যাগ নিয়ে ছাতাটা ভরে লাইব্রেরিতে গেলাম। ফাটাফাটিকে আর দেখলাম না।

পরদিন সকালে দুলাভাই ছাতাটা চাইলেন।

বললাম, ব্যাগে আছে, নিয়ে নিন।

অন্য ঘর থেকে তিনি বললেন, কোনটা নেবো, দুটো ছাতা তো!

আমি তো অবাক। দুটো মানে! সত্যি দেখলাম একই রকম দুটো ছাতা। বুঝতে বাকি রইলো না যে সেই ছাতাটা কাল নিজের মনে করে ব্যাগে ঢুকিয়েছিলাম তা আমার নয়। এবং ছাতাটা যে ওই ফাটাফাটি মেয়েটার তাও বুঝলাম। কেননা আমার আগে শুধু সেই ব্যাগ জমা দিয়েছে। ভাবতে অবশ্য ভালোই লাগছিল অন্তত আরো একবার তার সঙ্গে আমার দেখা হবে ছাতাটা ফেরত দেয়ার সময়।

পরদিন লাইব্রেরি গেটে নোটিশ দিলাম। একটি ছাতা পাওয়া গেছে। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে ছাতাটা সংগ্রহ করুন। যোগাযোগ : রাসেল, সকাল ১০টা থেকে ১১টা, হাকিম চত্বর।

পর পর তিন দিন কেউ এলো না। চতুর্থ দিন ১০টা ৩৫ মিনিটে তিনি এলেন। সে বুঝতে না পারলেও আমি ঠিকই বুঝলাম তিনি ছাতার খোজেই এসেছেন। কোনো কথা না বলেই ছাতাটা এগিয়ে দিলাম। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি করে বুঝলেন ছাতাটা আমার! আর প্রমাণ না নিয়েই দিয়ে দিলেন কেন?

উত্তর দিলাম, জানি না। তবে মিথ্যা প্রমাণ দিয়ে একটা ছাতা নেয়ার মতো মেয়ে যে আপনি নন সেটা বোঝার ক্ষমতা উপরওয়ালা আমায় দিয়েছে। কোনো উত্তর না শুনেই আমি সোজা লাইব্রেরিতে।

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে বন্ধুকে কাহিনী বললাম। সেই ছাতাটা হাতের কাছেই ছিল। হাতে নিয়ে বন্ধুকে দেখাতে গিয়েই আমি তো থ। নিজের ছাতা ভুল করে দিয়ে সেই ফাটাফাটি মেয়েরটা রেখে দিয়েছি। এতো এক মহা ফ্যাসাদে পড়লাম। বাসার সবাই অট্টহাসি দিল।

বন্ধুটি হাসতে হাসতে বললো, তোর জন্য ভালো হলো। আবার তার সঙ্গে দেখা হবে।

কিন্তু কি করে হবে। কিছুই তো জানি না।

সপ্তাহ দুই পরের কথা। হঠাৎ একদিন বাস থেকে মসজিদ গেটে নেমে দেখি *শ্রাবণ* বাস থেকে এই মাত্র মেয়েটি নামলো। কিছুদূর গিয়ে এক্সকিউজমি বলতেই মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখে বললো, ভুল করে আমার ছাতাটা দিয়ে দিয়েছি, সরি! এই তো বলবেন?

বললাম, কি করে বুঝলেন?

ইচ্ছে করে নিজের ছাতাটা অন্যকে দেয়ার মতো ছেলে যে আপনি নন সেটা বোঝার ক্ষমতা উপরওয়ালা আমায় দিয়েছে বলেই সে হাসতে লাগলো।

আমিও হেসে ফেললাম। পরিচয় হলো। সে ল’ সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। ছাতাটা আগামীকাল ফেরত দেবো বলতেই সে বললো, গতবার আপনি স্থান, কাল নির্ধারণ করেছেন। এবার আমি ঠিক করবো ছাতা কোথায় হস্তান্তর হবে। স্থান হলো কলাভবনের সামনের *দিল* চত্বর। সকাল নয়টা।

পরদিন সকালে উঠে মেঘ দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এই আবহাওয়ায় মেয়ে আসবে বলে মনে হয় না। নাশতা না খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। ইউনিভার্সিটিতে পৌছাতে ৯টা ২০ বেজে গেল। দূর থেকে দেখলাম তিনি ভিসি স্যারের বাড়ির দিকে মুখ করে বসে আছেন। হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে ফোটায় ফোটায় বৃষ্টি শুরু হলো। আমি ব্যাগ থেকে ছাতাটা বের করে যেই খুললাম অমনি বাতাসে ছাতা উল্টে পট পট করে চারটি শিক ভেঙে গেল। একেবারে বোকা বনে গেলাম।

বৃষ্টি তখন মোটামুটি জোরেই শুরু হলো। দেখতে পেলাম তিনি কলাভবনের দিকে আসছেন। আমি কি করবো না ভেবে পেয়ে দাড়িয়েই থাকলাম। অপরাজেয় বাংলার সামনে আমাকে ক্রস করার সময় দেখে বললো, এতো দেরি করলেন কেন? এরপর হাতের দিকে চোখ পড়তেই অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি, ছাতাটা ভেঙে ফেলেছেন?

আমি মাটির দিকে তাকিয়ে দোয়া করছি *ইয়া গড* রক্ষা করো। দশ বারো সেকেন্ড কোনো আওয়াজ না শুনে তাকিয়ে দেখি তিনি আমার ছাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে আছেন।

বললাম, ছাতাটা মেলে ধরুন, ভিজে যাচ্ছেন তো?

সে বললো, আপনিও তো ভিজছেন।

আমি তার হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে মেলে ধরতেই সে বললো, ভিজে যখন গেছিই তখন আর কি। আসুন দুজন মিলেই বৃষ্টির পানিতে ভিজি।

এ কথা বলেই সে ইন্টারন্যাশনাল হলের দিকে হাটতে লাগলো। আমি তার বৃষ্টি স্নানের সঙ্গী হলাম। খুব কাছ থেকে তরুণী মেয়েকে বৃষ্টির পানিতে অল্প অল্প করে ভিজতে দেখার অনুভূতিটা কেমন ছিল সেটা বুঝতে পারছি না। কেননা ইতিমধ্যে আমরা আরো কয়েকবার এক সঙ্গে ভিজেছি কি না এ জন্য অনুভূতিটা কিছুটা ভোতা হয়ে গেছে।

সেদিনের পর আমার জ্বর, তার দেখতে আসা কপালে তার হাতের স্পর্শ, আরো অনেক কিছু। সব হয়তো নিখুতভাবে মনেও পড়ছে না। তবে সেদিনের তার শেষ কথাটি এখনো মনে আছে। আমি যখন তাকে আমার ছাতাটা নিয়ে যেতে বললাম তখন সে বলেছিল, এটা তো এখন আমাদের দুজনের।

সেই দিনের পর ঠিক ২১ দিনের মাথায় আমরা দুজন দুজনের হয়ে গেলাম। আমার জীবনে ছাতার এতো বড় আশীর্বাদ কি ভোলা যায়, না ভোলা উচিত?

*ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে*

## সাপ ডিজাইন

-- ইউসুফ সুলেমান

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে নানান ভয়-ভীতি, শঙ্কার মধ্যে অফিসে যাওয়া-আসা শুরু করি। সড়কে যানবাহন ও গণচলাচল ছিল সীমিত। ফুটপাথে চলাচল করতো হাতেগোনা কয়েকজন মানুষ।

দিনটি ছিল মেঘলা। অফিস থেকে ফেরার পথে আগ্রাবাদ জেকসে গিয়েছিলাম দুই বন্ধু কি একটি জিনিস কেনার জন্য। বের হতেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। হাতে থাকা কভারযুক্ত ছাতাটির বোতাম টিপলে সাপের ফনার মতো মুহূর্তের মধ্যে খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি পাক আর্মি জিপ হঠাৎ ব্রেক করে আমাদের পেছনে দাড়িয়ে যায়। ব্যাপারটি বুঝে উঠা সম্ভব ছিল না। বন্ধুর পরামর্শে পেছনে তাকালাম না। জিপটি শো করে বন্দরমুখী রওনা হলো। একজন পথচারী পেছন থেকে চুপিচুপি জানালো, আর্মিরা মনে করেছে ছাতাটি কোনো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। হাফ ছেড়ে বাচলাম।

ছাতাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে চাইনিজ ছাতাটি কিনেছিলাম ২৫ টাকায়। বিদেশি জাহাজের এক নাবিক থেকে চকচকে পাতলা কাপড় ও নিকেল বাটের ছাতাটি ছিল অন্য ছাতা থেকে ব্যতিক্রম। ছাতাটি নিয়ে যখন কোথাও বের হতাম তখন মনে হতো কোনো বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলছি। বেশ আনন্দ পেতাম। এটির যত্ন করতাম। কখনো দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে শোভা পায়নি। আমার এক ঘনিষ্ঠতম তরুণ আত্মীয় সাপ ছাতাটি নিয়ে স্থানীয় হর্স-শু লেকে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যায়। সেদিন হঠাৎ দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় সাধের ছাতাটি দুমড়ে মুচড়ে চেহারা পাল্টিয়ে দেয়। তাদের কিছু বলা হতে বিরত রইলাম।

পরের দিন তরুণটি পাহাড়তলীর সমস্ত ছাতা মেকারের কাছে দৌড়াদৌড়ি করেও ছাতাটি মেরামত করতে পারেনি। মনের দুঃখ মনে চাপা রাখলাম। অভয়ও দিলাম বিশ বছর আগে এটি যদি পাক আর্মিরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতো। অবিকল ছাতা কেনার জন্য সিঙ্গাপুর মার্কেটসহ চট্টগ্রামের বড় বড় ছাতার দোকান ও অন্যান্য মার্কেটগুলোতে হন্যে হয়ে খুজেছি। দুর্ভাগ্য, এ ডিজাইনের কোনো ছাতা আমার নজরে পড়েনি।

ছাতাটির কথা মনে পড়লে এখনো হাসি পায়। সাপ ছাতাটিকে অস্ত্র ভেবে পাক আর্মির জিপ ব্রেক কষে দাড়ানোর ঘটনাটি কখনোই ভুলবো না।

*-- পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম থেকে*

## স্টিলের বাট

**-- শামীমা নাসরিন**

যে ঘরে আদর, যত্ন, ভালোবাসা, অর্থবিত্ত কোনো কিছুরই কমতি নেই সেই ঘরে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলে লোকে বলে *সোনার চামচ* মুখে নিয়ে জন্মেছে। আর যারা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মে না তারা কি চামচ মুখে নিয়ে জন্মে? রূপা, তামা, নাকি দস্তার? এ প্রশ্ন কারো কাছে করা অবান্তর।

আমার ধারণা আমি সোনা, রূপা, তামা কিংবা দস্তা, এমনকি মেলামাইনের চামচ মুখে নিয়েও জন্মাইনি। আমি জন্মেছিলাম একটি বাট মুখে, Sorry হাতে নিয়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার জন্ম হয়েছিল একটি সুন্দর ঝকঝকে স্টেইনলেস স্টিলের ছাতার বাট হাতে নিয়ে। এজন্য বোধহয় অনার্স পড়ুয়া এই আমি এখনো ছাতার বাট হাত থেকে দূরে সরাতে পারলাম না। কতো লোকের কতো কথা শুনলাম, বন্ধু-বান্ধবী কতো হাসি-ঠাট্টা করলো, কতোবার ছাতা হারালাম। বাবা-মায়ের ঝগড়ায় ক্ষত-বিক্ষত হলাম তার কোনো হিসাব নেই। এতো কিছুর পরও সেই ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত ছাতা আমার পাশে সব সময় সঙ্গী হয়ে আছে। যখনি বাইরে বের হই তখনি একটা ছাতা ছাড়া যেন ভাবতেই পারি না পথ চলার কথা।

যখন ক্লাস ওয়ান-এ পড়ি তখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহ থেকে তার একমাত্র আদরের কন্যাকে রক্ষা করার জন্য আমাকে বাবা সুন্দর ছোটখাটো স্টেইনলেস স্টিলের বাটযুক্ত ও কালো কাপড়ে আবৃত একটা ছাতা উপহার দিয়েছিলেন। সেদিন আমার সেকি আনন্দ! ছাতার প্রতি সেদিন আলাদা কোনো টান অনুভব করেছিলাম কি না মনে নেই। তবে নতুন কোনো বস্তুর প্রতি মানুষের একটা আলাদা আকর্ষণ তো থাকেই। হয়তো সেই আকর্ষণের কারণেই তার পরদিন থেকে স্কুলে যাওয়ার সময় ছাতা হয়ে উঠলো আমার নিত্যসঙ্গী। এমন কোনোদিন ছিল না যেদিন আমি ছাতাটা সঙ্গে রাখতাম না, হোক সেটা ছাতা নেয়ার উপযোগী বা অনুপযোগী আবহাওয়া। ধীরে ধীরে পরিচিত মানুষের চোখে ব্যাপারটা হয়ে উঠলো পরিচিত একটা দৃশ্য। বন্ধু-বান্ধবীরা ব্যাপারটা নিয়ে এতো বেশি হাসি-ঠাট্টা করতো যে, মাঝে মাঝে প্রতিজ্ঞা করতাম প্রয়োজন ছাড়া আর স্কুলে ছাতা নিয়ে আসবো না। কিন্তু স্কুলে যাবার সময় সেই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যেতাম।

এভাবে প্রাইমারি স্কুল পার করে ভর্তি হলাম গার্লস হাই স্কুলে। আমার বান্ধবীরা ভেবেছিল এবার বোধহয় ছাতা নেয়ার অভ্যাসটা বদলাবো। তবে ব্যাপারটা ঘটলো সম্পূর্ণ বিপরীত। সবাই অবাক হয়ে দেখলো, শুধু স্কুল নয়, বাইরে কোথাও বের হলেই ছাতা আমার সঙ্গী হয়েছে।

বান্ধবীরা যখন কোনোভাবেই আমার অভ্যাসের পরিবর্তন করতে পারলো না তখন আমাকে *ছাতাওয়ালী* বলে ডাকা শুরু করলো। বান্ধবীরা আরো বললো, আমার বিয়েতে তারা সবাই একটা করে ছাতা উপহার দেবে এবং আমার বাসরঘর সাজানো হবে ছাতা দিয়ে। এসব শুনে বিরক্ত হবার কথা অথচ বেশ আনন্দ পেলাম। এভাবে বিভিন্ন হাসি–ঠাট্টার ভেতর দিয়ে এসএসসি পাস করে ভর্তি হলাম শহরের একটা কলেজে। কলেজের প্রথম দিনেও ছাতাকে সঙ্গী করতে ভুল হলো না আমার। কিন্তু কলেজে ঢোকার একটু পরই লক্ষ্য করলাম, সবাই আমার দিকে একটু অন্য রকম দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। মনে মনে বললাম, যেভাবেই তাকাও না কেন প্রতিদিন এভাবেই আমার হাতে একটা ছাতা দেখতে পাবে।

সাত আট মাস পরের ঘটনা। একদিন ছাত্রী কমন রুমে বসে আছি। হঠাৎ আমার এক ক্লাসমেট জিজ্ঞাসা করলো, কি, আজ তোমার সঙ্গীকে সঙ্গে আনোনি?

ভাবলাম, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সুমীর কথা জিজ্ঞাসা করছে। বললাম, আজ সুমী একটা বিশেষ কারণে কলেজে আসেনি।

সে হাসি হাসি মুখ করে বললো, আরে, তোমার ছাতা সঙ্গীর কথা বলছি।

কথাটা শুনে বেশ অবাক হলাম এবং বুঝতে পারলাম কলেজের শত ব্যস্ততার মাঝেও অনেকেই আমার প্রতিদিন ছাতা আনার ব্যাপারটা ভালোভাবেই খেয়াল করেছে। ছাতাকে সঙ্গী করার ফলে আমার জীবনের ঝুড়িতে একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল। তা হচ্ছে, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধুতার মুখোশধারী অনেক চোরও থাকে। সেই সব চোরদের কোনো একজন কমন রুম থেকে আমার অতি প্রিয় একটা ছাতা সুযোগ বুঝে চুরি করেছিল যার সন্ধান কখনো পাওয়া যায়নি। শুধু যে এই একটা অভিজ্ঞতা তা নয়, আরো অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এই ছাতার কারণে। তার কোনোটি আনন্দের, কোনোটি বেদনার।

ছাতা হাতে চলতে চলতে আজ অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। এখনো রাস্তায় পুরনো কোনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হলে হাসিহাসি মুখ করে বলে, কিরে, এখনো ছাতা ছাড়তে পারলি না?

আমিও মুচকি হেসে উত্তর দিই, আমি ছাতা ছাড়লে তোদের দেয়া এতো সুন্দর নামটার অবমাননা করা হবে যে! আর মনে মনে বলি, কি করে ছাতা ছাড়ি বল? এখন তো ছাতা আমার জীবনেরই একটা অংশ হয়ে গেছে। যখন রাস্তায় একা একা পথ চলি তখন মনে হয়, আমি একা নই, আমার সঙ্গে এমন এক বন্ধু আছে যে শুধু রোদ–বৃষ্টি নয়, আরো অনেক বিপদে আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে সেই বন্ধুটি হচ্ছে আমার পথ চলার সঙ্গী, আমার খুব প্রিয় বস্তু ছাতা।

## বন্ধু

-- কনক কমল

তখন ক্লাস সেভেন-এ পড়ি। থাকি মফস্বল শহর কুষ্টিয়াতে। স্কুলটা বাসা থেকে খুব বেশি দূরে না হলেও খুব একটা কাছে না। তবুও হেটেই যাই কয়েকজন মেয়ে মিলে। গায়ের রঙ এমনিতেই কালো। এটা আরেকটু বেশি কালো না হয়ে যায় এই ভয়ে আম্মা একটা ছাতা কিনে দিলেন। কমলা রঙের ফোল্ডিং ছাতা। খুব সুন্দর। কেন জানি না তখন ছাতা হাতে নিতে খুব লজ্জা লাগতো। কিন্তু কিছু করার নেই। আম্মার বকুনির ভয়ে সেটা হাতে নিয়ে বাসা থেকে বের হতেই হতো।

অবশ্য কিছুদূর যেয়েই ছাতাটা গুটিয়ে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিতাম। কারণ রাস্তার ধারের তিন তলা বাসাটার দোতলার বারান্দায় আমার চেয়ে চার পাচ বছর বড় একটা ছেলে প্রতিদিন স্কুল যাওয়া-আসার সময় দাড়িয়ে থাকে। আড়চোখে দেখি মাঝে মাঝে। বান্ধবীরা বলে, ছেলেটা নাকি আমার জন্যই দাড়িয়ে থাকে। সেই বিল্ডিংটার কিছুটা আগেই ছাতাটা বন্ধ করে ফেলি প্রতিদিন।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও বিকেলে স্কুল থেকে ফিরছিলাম। আজ আমার সঙ্গে কেউ নেই। তারা সবাই মিলে ভিউকার্ড কিনতে দোকানে গেছে। দেরি হলে আম্মা বকা দেবেন এই ভয়ে একাই চলে এসেছি। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে সেই ছেলেটাকে দেখার ইচ্ছা তো আছেই। দেরি করলে যদি না থাকে এ জন্য সাত পাচ ভেবে একাই রওনা হয়েছি।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস চারদিকে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। রিকশা নেবো নাকি হেটেই যাবো ভাবতে ভাবতেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি চলে এলো। ছাতা মাথায় হাটছি আর রিকশা খুজছি। পাচ্ছি না। প্রচণ্ড বাতাস। হাটতে হাটতে সেই বিল্ডিংটার সামনে চলে এসেছি। আড়চোখে দেখলাম আছে কি না।

হু, আছে। ছাতাটা বন্ধ করে ফেলবো ভাবছি এমন সময় হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় হাত থেকে ছাতাটা ছুটে গেল। ফাকা রাস্তা। আমার ছাতাটা লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়াচ্ছে। হায়, হায়! আমি এখন কি করবো। ছাতার পেছন পেছন আমিও দৌড় দিলাম। যেই ছাতাটাকে ধরতে যাই অমনি সে আরেক লাফ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার লাফ দিই। কিন্তু ধরতে পারছি না। চোখ ভরে গেছে পানিতে লজ্জায়। দেখি ছেলেটা মিটিমিটি হাসছে। আমার আর কিছু করার নেই।

যাকগে, ছাতা চুলোয় যাক। ভিজে যাই আমি। কিছু লাগবে না আমার। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে আম্মার ওপর। কাদতে কাদতেই মাথা নিচু করে পা বাড়ালাম সামনের দিকে। আরেকবার তাকালাম

দোতলার বারান্দার দিকে। না নেই। ভালোই হলো। বাসায় চলে যাই। পা বাড়াতেই থমকে গেলাম। আমার ছাতা আমার সামনে এবং ছাতাটা ধরে দাড়িয়ে আছেন স্বয়ং দোতলার বারান্দাবাসী বন্ধু আমার।

*ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে*

## জমিদারি বিয়ে

**-- হাসান হায়দার লাভলু**

বিশ্বের অন্যতম মুল্যবান সুগন্ধি আগর, আতর উৎপাদন একমাত্র এ গ্রামেই হয়। এ গ্রামই দাবি রাখতে পারে বাংলাদেশের একমাত্র সমৃদ্ধি গ্রাম হিসেবে। জনবহুল এই গ্রামের ৯০ ভাগ লোকই ধনী। প্রতিটি বাড়ি পাকা করা। কোনো কোনোটি বাংলো টাইপের। প্রত্যেক বাড়ির সীমানা প্রাচীর পাকা দেয়াল।

আধুনিকতার সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই গ্রামে। প্রত্যেক বাড়িতে রয়েছে ড্রয়িং রুম, অ্যাটাচড বাথ, কার্পেট মোড়ানো, বিদেশি শোপিস সামগ্রী, বাথরুমে রয়েছে আধুনিক ফিটিংস। শ্যালো পাম্প দিয়ে ওভার হেড ট্যাংকে পানি উঠানো প্রত্যেক বাড়িতে। রয়েছে রঙিন টেলিভিশন, ভিসিআর, টেলিফোন, ফৃজ। নিজেদের ব্যবহারের জন্য গাড়ি। এছাড়াও গ্রামের মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রয়েছে রেন্ট-এ কার ব্যবস্থা। পনেরো বিশটা মাইক্রোবাস কার স্ট্যান্ডে মজুদ থাকে। সৃষ্টিকর্তা কি না দিয়েছে এই গ্রামবাসীকে। অভাব রয়েছে সঠিক নেতৃত্বের ও ভ্রাতৃত্ববোধের।

বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানায় এই গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামের নাম সুজানগর। এ গ্রামেই দুইটা জমিদার বাড়ি রয়েছে। জমিদার বাড়ির প্রধান মৌলভি সিদ্দিক আলী ও হাজি জাফর মুহম্মদ। সমাজের উন্নয়ন ও মানব কল্যাণে এদের দুইজনের খ্যাতি রয়েছে।

আজ থেকে শত বছর আগের কথা। সিদ্দিক আলীর বড় ছেলে আবদুস সাত্তার ও জাফর মুহম্মদের বড় মেয়ে মোসাম্মাৎ মুহিবুন্নেসার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়। মুহিবুন্নেসা সুন্দরী ছিলেন না। তাতে কি? জমিদারের বেটি বলে কথা! আবদুস সাত্তার ছিলেন সুদর্শন। কিন্তু বিপত্নীক।

যাই হোক, উভয়ের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়। দুই জমিরদার বংশের বিয়ে বলে কথা। সাত দিন আগে থেকে সাজসাজ রব। গানে গানে মুখরিত দুই পরিবার তথা সমগ্র গ্রাম। দুই বাড়ির দূরত্ব মাত্র আধা মাইল। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি পর্যন্ত দুই ধারে এক গজ অন্তর অন্তর কলা গাছ লাগানো হয়েছে। আলোকসজ্জার জন্যে প্রতিটি কলা গাছের পাতায় পাতায় লাগানো হয়েছে হাজার হাজার

মোমবাতি। বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোমাস জ্বালানো হয়। অপূর্ব অথচ জৌলুসপূর্ণ এই দৃশ্য। সিদ্দিক আলী তার সকল হাতিকে নানান রঙে সাজান। বর যে হাতি করে যাবে সেই হাতির ওপরে বিশেষভাবে নির্মিত হয় মঞ্চ। বরের জন্য তৈরি করা হয় বৃহদাকারের মূল্যবান ছাতা। রাজকীয় কায়দায় বরযাত্রীদের ঘোড়া ও হাতিতে নেয়ার ব্যবস্থা হয়।

যথারীতি বরযাত্রা শুরু। কন্যার বাড়ির সীমানায় পৌছতেই বাধা। কি বিষয়? কোনো সমস্যা? হ্যা, এই ছাতাই সকল সমস্যার মূল। জাফর মুহম্মদ–এর পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী ছাতা মাথায় করে তাদের বাড়িতে কেউ ঢুকতে পারবে না। বরপক্ষকে ছাতা গোটানোর জন্য বলা হলো। কিন্তু বরপক্ষের কথা, আমরা ছাতা মাথায় করেই ঢুকবো। দুপক্ষই অটল। কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ। দিন গড়ায়, রাতও গড়ায় কোনো সমঝোতায় উপনীত হতে পারেনি।

বরপক্ষ পথের মধ্যে তাবু টেনে রাত যাপন ও গরু জবাই করে খাবার ব্যবস্থা করে। এই অবস্থায় দেখে দূর গ্রামের মাতব্বররা সমাধান করার জন্য ঝাপিয়ে পড়ে। অবশেষে তিন দিন পর ফয়সালা হয়। আবদুস সাত্তার মাথায় ছাতা নিয়ে তার স্বপ্নের রানীকে বিয়ে করে বাড়িতে আনেন।

আজ এ দুই বাড়ির জীর্ণ দশা। দুই পরিবারের সদস্য সিলেট, ঢাকা, বম্বে, দোহা, কুয়েত, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, ডালাস এবং আরো অনেক সিটিতে বসবাস করছেন। তারা সবাই একদিনের জন্যে এ গ্রামে যদি আসতেন তাহলে সারা গ্রাম কতোই না মুখরিত হতো।

*উত্তরা, ঢাকা থেকে*

## কেবলা সাহেব

### -- ইব্রাহীম খান

আমি তখন তালোড়া আলতাফ আলী হাই স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। গুটি গুটি পা পা করে আমাদের স্কুলে সহশিক্ষা চালু হতে চলেছে। সর্বসাকুল্যে পাচ ছয়জন ছাত্রী পড়ে। সালোয়ার কামিজ আর ওড়নায় সারা শরীর ঢেকে একেকজন কাপড়ের পুটলি সেজে স্কুলে আসে। স্যারের পেছনে পেছনে ক্লাসে আসে এবং স্যারের পেছনে পেছনে যায়।

এরই মধ্যে বন্দরের এক ব্যবসায়ী মুকুন্দ বাবুর মেয়ে মালতী রানী একদিন ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়ে স্কুলে আলোড়নের সৃষ্টি করলো। মেয়েটির বয়স বারো তেরো, সুন্দরী এবং স্মার্ট। যতোটা সুন্দরী তার চেয়ে অনেক বেশি তার সাজগোজ। সে মাস দুই স্কুলে যাতায়াত করেছিল। এর মধ্যে তার কিউটিকুরা

পাউডার, পন্ডস কৃম, আর ইভিনিং ইন প্যারিস এসেন্সের উৎকট ঘ্রাণে আমরা অকালপক্ব হলাম। আমাদের ঠোটে ঠোটে এলো শিস, গলায় গলায় এলো গান –

*চোখে চোখে রাখি তারে, তবু ধরা যায় না*

*মন যারে চায় তারে কেন পায় না।*

স্কুলের ঢুড্ডা মার্কা ছেলেরা মালতির পিছু লাগলো।

হেড স্যার প্রমাদ গুণলেন। একদিন মুকুন্দ বাবুকে ডেকে তিনি পরামর্শ দিলেন, মশায়, আপনার মেয়েকে যদি এখানে পড়াতে চান তাহলে আর পাচটা মেয়ের মতো সাধারণভাবে স্কুলে পাঠাবেন।

ফল ফললো। পরদিন থেকে মেয়েটির পোশাক–আশাকে যেন বৈধব্য দশা এলো। কিন্তু হলে কি হবে? জলাশয়ে একবার ঢেউ উঠলে সহজে কি তার প্রতিক্রিয়া থামে? মেয়েটাকে স্কুল ছাড়তেই হলো।

কিছুদিন পর শোনা গেল, আমাদের নবাগত হক স্যার নাকি বাড়িতে গিয়ে মালতীকে পড়ান। বার্ষিক পরীক্ষার সময় মালতী স্কুলে এসে শুধু পরীক্ষা দেবে। এপ্রিল মাসেই আমরা অধীর আগ্রহে বার্ষিক পরীক্ষার দিন গুণতে লাগলাম।

গ্রীষ্মকাল, মর্নিং স্কুল চলছে। আমাদের গ্রামের বিভিন্ন ক্লাসের ছয়জন ছাত্র সকালে স্কুলে যাচ্ছি। স্টেশন পার হয়ে যেতেই দেখছি স্টেশনের জেনানা ওয়েটিং রুমের বাইরে একটা জটলা। কাছে গেলাম এবং দেখলাম *উত্তরা* আর *মেরিনা* সিনেমা হলের চলমান সিনেমার রঙিন পোস্টারের পাশে বড় সাইজের দুটো হাতে লেখা পোস্টার দেয়ালের বেশ উচুতে শোভা পাচ্ছে। অপটু পটুয়ার আকা একটা মেয়ে আর একজন পুরুষের পটের নিচে লেখা আছে, হাসানুল হক+মালতী। আমরা বেশ মজা উপভোগ করছিলাম।

হঠাৎ দেখি আমাদের কেবলা সাহেব অর্থাৎ আরবি শিক্ষক আসছেন। আমরা উধাও। সাহসী শহীদুল শুধু জটলার এক কোণে ঘাপটি মেরে থাকলো। কেবলা সাহেব পোস্টার দুটো দেখেই তওবা তওবা বলে রঙ চটা শতছিদ্র তালি দেয়া ছাতার কাঠের বাট দিয়ে ঘষে ঘষে একটা পোস্টার তুলতে লেগে গেলেন। কয়েক ঘষা দিতেই ছাতার বাট গেল ভেঙে। অবস্থা দেখে স্টেশনমাস্টার একজন পোর্টারকে টেবিলের ওপর উঠিয়ে এক বালতি পানি দিলেন। নিমেষেই দেয়াল ফকফকা।

কেবলা সাহেবের বাড়ি কাজিপুরের মেছরা গ্রামে। তিনি খুব গরিব মানুষ ছিলেন। মাথায় ঝুটিওয়ালা লাল ফেজ টুপি পরতেন। তার ছাতার কাপড়ের চেয়েও জরাজীর্ণ তার পায়জামা–পাঞ্জাবি। সামান্য যা বেতন পেতেন তা দেশে পাঠিয়ে দিয়ে জায়গীর থেকে কোনো রকমে দিন চালাতেন। সকালে এক

টোঙা মুড়ি আর এক কাপ চা দিয়ে নাশতা করতে তিনি বাজারে এসেছিলেন। আফসোস, বেচারার ছাতাটা নষ্ট হয়ে গেল।

আজ বড় বেদনা পাই। লেখাপড়া শেষ করে যখন উপার্জন করতে শিখলাম তখন কেবলা সাহেবকে একটা ছাতা উপহার দিইনি কেন?

আজ তিনি বেচে নেই। নগ্ন আর অশ্লীল পোস্টারে পোস্টারে আমাদের দেয়াল আজ ভরে গেছে। অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি আর পর্ণোগ্রাফি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। এসব মরণ ব্যাধিতে আমাদের এক মহান নেত্রীও আক্রান্ত।

যদি আজ কেবলা সাহেব বেচে থাকতেন তাহলে দুই চারটা ছাতার বাট ভেঙে তিনি হয়তো এই নষ্ট গতির কবল থেকে জাতিকে বাচাতে পারতেন। তিনি নিশ্চয়ই একা ছিলেন না, কিছু সৎ ও বিবেকবান স্টেশনমাস্টার এবং পোর্টার তো তার পেছনে ছিলেনই।

*সপুরা, রাজশাহী থেকে*

## শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ

### -- ভ্রান্তি হরণ রায়

এলাকায় ভালো ছাত্র হিসেবে যেমন পরিচিত ছিলাম তেমনি ভালো খেলোয়াড় হিসেবে বেশ সুনাম ছিল সে সময়। কোথাও ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে চাচাতো জেঠাতো পাচ ভাই ডাক পেতাম। অবশ্য এ জন্য বাড়িতে বাবা–মা এমনকি বড় ভাইবোনেরা ভীষণ বকা দিতেন। মাঝে মাঝে ভাত বন্ধেরও হুমকি দিতেন। কিন্তু যখন খেলার মজার ঘটনা বলতাম কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি করতাম যেমন *আনন্দহীন শিক্ষা শিক্ষাই নয়* তখন ক্ষান্ত হতেন। তাছাড়া খেলাধুলা করে রেজাল্ট খারাপ করছি এমনটি তো হচ্ছে না। তবুও অঘটনের আশঙ্কায় প্রায়ই বাধা দিতেন।

তখন সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছি। *কুছ পরোয়া নেহি* এমন ভাব নিয়ে স্বদলবলে খেলতে যেতাম। মাঝে মাঝে ভাড়ায় খেলতে যেতাম। এটা বাবদ কিছু টাকা পেতাম যা দিয়ে ছোট বনভোজের আয়োজন করতাম। এ সময়টা বেশ মজায় কাটতো।

আমাদের বাড়ি থেকে আট মাইল দূরে স্থানীয় এক ক্লাবের উদ্যোগে ১৬ টিমের এক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যবারের মতো সে বছরও আমরা এক ক্লাবের হয়ে খেলতে যাই। এদিন সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আমাদের পাচজনের মধ্যে ক্লাইভ, দিলীপ ও বিশ্বজিৎ ডিফেন্সে এবং আমার ছোট ভাই প্রদীপ ও আমি স্ট্রাইকার হিসেবে খেলছি। খেলার মাঝে বিরতির আগেই

পেনাল্টি গোলে আমাদের বিপরীত দল এগিয়ে গেল। আমাদের দল ভালো খেলেও পরাজয়ের সম্মুখীন এ জন্য সবাই উদ্বিগ্ন। বিরতির পর জয়ের লক্ষ্যে সে রকমই আক্রমণ চালাচ্ছি। ১০ মিনিটের মাথায় ছোট ভাইয়ের এগিয়ে দেয়া বলে গোল করে ফেললাম। এরই পাচ মিনিট পর আরেকটি গোল দিয়ে ফেললাম। বিপত্তি ঘটলো তখনই। রেফারি যদিও গোলের সিদ্ধান্ত দিয়েছে তবুও প্রতিযোগী দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকরা তা মেনে নিতে রাজি নয়। তাদের অভিযোগ, অফসাইড হয়ে গোলটি দিয়েছি।

কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বেধে গেল হাতাহাতি। যে যেদিকে পারে দৌড়াচ্ছে। ড্রেস পরিহিত থাকায় আক্রমণটা হচ্ছে শুধু খেলোয়াড়দের ওপর। আমি দিশাহারা। কিছু বোঝার আগেই দেখি সবাই পালাচ্ছে। আমার পিঠের ওপর আস্ত এক একটা কাঠের ছাতার বাট ভাঙছে। পালানোর কোনো পথ নেই। ঘিরে আছে ছয় সাতজন ছেলে। যে যা পারছে কিল–ঘুসি, টানাটানি করছে। পিঠে কয়টি ছাতা ভাঙলো খেয়াল নেই। তবে একজনের হুঙ্কার শুনতে পেলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমার গেঞ্জির কলার টেনে ভিড় থেকে বের করলো। তাও আমার ছাতার হাতল দিয়ে। আমার তখন অবস্থা *ছেড়ে দে মা কেদে বাচি।* কিন্তু জাদরেল চেহারার লোকটি আমাকে আঘাত করার পরিবর্তে আমার দিকে তেড়ে আসা ছেলেগুলোকে দুচার ঘা বসিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই দেখি ছেলেরা সব পালালো।

মনে পড়লো খেলার মাঠের মারপিট থেকে ইন্দ্রনাথ কর্তৃক শ্রীকান্তকে উদ্ধার করার ঘটনা, যা আমার জীবনেও ঘটে গেল। ভদ্রলোক গর্জনের সঙ্গে বললেন, কোনো ভদ্র ঘরের ছেলে এদের সঙ্গে খেলে। এরা সব ডাকাত, কোথাও লাগেনি তো?

লজ্জায় কিছু বলতে না পারলে শুধু উচ্চারণ করলাম, তেমন লাগেনি। অথচ পিঠ সোজা করতে পারছিলাম না। গণ্ডগোল থেমে যাওয়ার পর আমার সঙ্গী খেলোয়াড়রা আমাকে খুজতে এসেছে তাদের তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু আমি তো মার খেয়েছি তার ওপর জার্সি সম্পূর্ণ ছেড়া। সবারই মন খারাপ। জানতে পারলাম আমাকে মারের হাত থেকে উদ্ধার করা ব্যক্তিটি সেখানকার ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার। তখন সন্ধ্যা প্রায়। তার বাসায় নিয়ে গেলেন। আমাদের খেলার প্রশংসা করলেন। নাশতা করানোর পর আমাদের বিদায় করে উপদেশ দিলেন জীবনের ঝুকি নিয়ে কোনোদিন না খেলতে।

আগে বকা আর ভাত বন্ধের হুমকিতে খেলা বন্ধ না হলেও সেদিনের ছাতার মার খেয়ে উচিত শিক্ষা পেয়েছিলাম। ফলে আর কোনোদিন সে মুখো হইনি।

*চট্টগ্রাম থেকে*

## হরি স্যার

**- - সালেহা আক্তার কল্পনা**

ছেলেবেলার কথা। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হরেন্দ্র কুমার পাল। পুরো এলাকাতেই যিনি *হরি স্যার* নামে পরিচিত। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে তিনি প্রায় ৪০ বছর শিক্ষকতা করেছেন। মনে পড়ে, বাবা যেদিন আমাকে প্রথম স্কুলে ভর্তি করেন সেদিন স্যারের হাত ধরে বলেছিলেন, কাকা আপনি এর দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনি খেয়াল না করলে এর লেখাপড়া হবে না।

মিষ্টি হেসে তিনি অভয় দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এ নিয়ে তোমার কিছু ভাবতে হবে না। তাছাড়া কল্পনা তো শুধু তোমার মেয়েই নয়, সে সঙ্গে আমার নাতনিও বটে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, আমার দাদা হরি স্যারের বাল্যবন্ধু ছিলেন।

যাই হোক, সেদিন স্কুলে ভর্তির পর ক্লাস না করে বাড়ি ফিরলাম বাবার হাত ধরে। পরদিন স্কুলে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ির উঠানে যেই না পা রেখেছি অমনি দেখি বাড়ির সামনে দাড়িয়ে স্যার আমার নাম ধরে ডাকছেন। তার পরনে ধুতি–পাঞ্জাবি, চোখে চশমা, পায়ে স্যানডাল এবং হাতে রোদ–বৃষ্টি থেকে রক্ষাকারী পরম বন্ধু ছাতা। বলা যায়, অনেকটা এ থেকেই শুরু। কিছুটা দ্বিধা–দ্বন্দ্ব, ভয় এবং সঙ্কোচ শুরুতে থাকলেও খুব শিগগিরই তা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

মহানুভব আর অদ্ভুত ব্যক্তিত্ববান এই মানুষটির সঙ্গে অল্প কয়েকদিনেই আমার এক অন্য রকমের সখ্যতা গড়ে উঠলো। অসমবয়সী এই বন্ধুত্ব আমার মা–বাবা, আপা আর জেঠাতো দাদারাও ভীষণ রকমের উপভোগ করতে লাগলো। আপা তো প্রায়ই খেপে বলতেন, হ্যারে, স্যার বোধহয় খাতির করেই তোকে একটু বেশি নাম্বার দেয়। হাজার হোক তুই তো শুধু তার ছাত্রী নয়, নাতনিও!

খুব রাগ করতাম তাদের কথায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সব ভুলে বই–খাতা হাতে বাড়ির উঠানে দাড়িয়ে থাকতাম স্যারের জন্য। মনে হতো এই বুঝি ছাতা হাতে আমার পরম পূজনীয় স্যার এলেন।

এমনিভাবে একটা সময় প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে গ্রামেরই হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। অর্থাৎ স্কুল বদল করলাম। কিন্তু দীর্ঘ দিনের সেই পুরনো অভ্যাসটা আমি কিংবা হরিদাদু আমরা কেউই ছাড়তে পারলাম না। তাই হাই স্কুলে উঠার পরও আমাকে আগেকার নিয়মেই হরিদাদু আনা–নেয়া করতেন। আমারও মনে হতো এটা আমার অবশ্য পাওনা।

কালের পরিক্রমায় এমনি করে একটা সময় এসএসসি পাস করলাম। এরই মাঝে আমার বাবা মারা গেলেন। স্বাভাবিকভাবেই গায়ের পরিবেশ আর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভেবে মা আমার বিয়ে

দিলেন। আমিও বাবার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি এলাম। তারপর প্রাকৃতিক নিয়মেই একটা সময় শ্বশুরবাড়ি এবং ঘর–সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু স্যার সেই পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারলেন না। মায়ের মুখে শুনেছি, আমার বিয়ের পরও স্যার রোজ আমাকে ডাকতে আসতেন। এরপর আবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে নীরবে প্রস্থান করতেন। সঙ্গে থাকতো তার সর্বক্ষণিকের সঙ্গী ছাতা।

*বনানী, ঢাকা থেকে*